শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গর্ভ স্তোত্র বা সম্বন্ধ তত্ত্ব চন্দ্রিকা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গর্ভ স্তোত্র বা সম্বন্ধ তত্ত্ব চন্দ্রিকা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভূমিকা

সত্যব্রতং সত্যপরং হইতে ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে পর্য্যন্ত ভাগবতোক্ত পঞ্চদশ শ্লোকাত্মক গর্ভস্তোত্র অতিশয় পবিত্র। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা ২৬ হতে ৪০ এই স্তবের বক্তা ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত বেদ তন্ত্রাদি হইতে সার তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া স্বল্পাক্ষরে বর্ণন করিয়াছেন, অতএব ইহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাই।

এই স্তবে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা শ্রুতি প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কেবল ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলেই জীবগণ চরিতার্থ হয়। এই গর্ভস্তোত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে জগদীশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া তাহাতে প্রতিভাত হন। অখিল জীবের প্রকৃতি দেবকীতে ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবাত্মার সহচর হইয়াছেন।

জীবের জ্ঞান স্বরূপ বসুদেব প্রথমে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তৎপ্রকৃতি মন স্বরূপ দেবকীকে ঐ পবিত্র ভাবটী অর্পণ করেন। এতন্নিবন্ধন দেবকীপ্রসূত ভগবানের নাম বাসুদেব হইয়াছে। বাসুদেব বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর। জীবের সংকীর্ণ জ্ঞানে যে পরব্রহ্মের প্রতিভা তাহাই বাসুদেব।

পরব্রহ্ম অবিতর্ক্য ও অচিন্ত্য অতএব জ্ঞান কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হন না। পরন্তু পরমেশ্বর ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা হয়; এতৎপ্রযুক্ত পরম কারুণিক বিভু অনুগ্রহপূর্ব্বক জীবের জ্ঞানের আত্মপ্রত্যয় বিভাগে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া মনো মধ্যে বিচরণ করেন। অবিবেচক লোকেরা জগদীশ্বরের অবতার স্বীকার করেন না। ইহাতে কেবল তাঁহারা আপনাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। পরমেশ্বরের বাসুদেব অবতার স্বীকার না করিলে নিরীশ্বর অথবা সত্যান্ধ হইয়া উঠিতে হয়। এই বাসুদেবের আবির্ভাব কালীন যে দেব-স্তুতি তাহা যে অমৃত-তুল্য ইহাতে সন্দেহ কি?

এই অপার জ্ঞান গর্ভস্তোত্রের সদর্থ নির্ণয় করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য নহে, তবে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব জগদ্গুরু শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যাহা কিছু নির্ণীত হইবে তাহা দয়া সমুদ্র বৈষ্ণব মহোদয়গণ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক, দাস প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় গ্রহণ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীধর স্বামীর কৃত ব্যাখ্যা যতদূর পারি অবলম্বন করিব। স্থানে স্থানে যদিও স্বামী বাক্যের অনুরূপ ব্যাখ্যা হইবে না তথাপি দয়ার্দ্র চিত্ত পাঠকগণ স্বামী প্রদত্ত ইঙ্গিতাবলম্বিত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার এই ভাষ্যকে গ্রহণ করিবেন।

বৈষ্ণবগণই আমার বান্ধব, তাঁহাদের চরণরেণুই আমার একমাত্র প্রার্থনা; যেহেতু তাঁহারা কৃপা করিলে আমার হৃদয়েশ্বর মহাপ্রভু আমাকে স্বীর দাসানুদাস বলিয়া জানিবেন। ইহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.২৬

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যং ঋতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও পূর্ণ স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের নিকট তিনটী শক্তির প্রকাশ আছে। অপর সমুদয় শক্তি জীবের পক্ষে অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য। জীব যদিও স্বয়ং অপ্রাকৃত, জ্ঞান ও আনন্দে ভূষিত তথাপি পূর্ণতার অভাব প্রযুক্ত পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্যক জানিতে পারেন না।

এই তিনটী শক্তির নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। চিচ্ছক্তিই পরব্রহ্মের স্বভাব। মায়াশক্তি ঐ স্বভাবের বিপরীত। জীবশক্তি চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ মায়াভিমুখ ধর্ম্ম যোগ্য। চিচ্ছক্তি পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, জীবশক্তি অপ্রাকৃতের অসম্পূর্ণ লক্ষণ এবং মায়াশক্তি অপ্রাকৃতের বিপরীত অর্থাৎ প্রাকৃত।

সমস্ত জড় জগতকে প্রাকৃত কহা যায় এজন্য ইহাকে মায়াশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা হয়। জগদীশ্বরে এই তিনটি শক্তি স্বীকার না করিলে কোন প্রকার বিচারের মীমাংসা হয় না, যেহেতু পরব্রহ্মে অপ্রাকৃত গুণ স্বীকার না করিলে ভয়ঙ্কর মায়াবাদের উদ্ভব হয়। বিপরীত গুণসকল যে পুরুষে সামঞ্জস্য ভাবে অবস্থিতি করে তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলি যথা নির্ব্বিকার ও সৃষ্টি করণের ইচ্ছা এবং চিচ্ছক্তির আনন্দময় বিলাস ও মায়াশক্তির অন্ধতম পরিচালনা একই কালে নির্ব্বিরোধ ভাবে পরমেশ্বরে দৃষ্ট হয়।

মানব অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত এ প্রকার সামঞ্জস্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। মায়া অসৎ অর্থাৎ অভাব সঙ্কল্প এ প্রযুক্ত জড় জগতে দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান এই জগতেই যে মায়া এমত নহে কিন্তু ইহা মায়াগর্ভ সম্ভূত। মায়া জগদীশ্বরের শক্তি মাত্র। সেই অনাদি শক্তিতে পরমেশ্বর যখন রমণ করেন তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সমস্ত সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ সহিত এই জড় ব্রহ্মাণ্ড মায়া প্রসূত। জননীর গুণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে উত্তরাধিকারিত্ত্ব সূত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। সত্ত্ব রজ তম দেশ কাল এই সমস্ত মহাগুণ ও তদনুলোম-বিলোম জনিত আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি-স্থাপকতা আকর্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুণসকল গুণবতী। মায়া হইতে দৃশ্য জড় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্যের অনুগামী তত্বতৃষ্ণুগণ এই মায়া ও তজ্জাত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ বা গুণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের বিচারে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ এই বিশ্বরূপ ভান কাহাতে হইতেছ ইহা যুক্তি দ্বারা কোন প্রকারে মীমাংসা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের মীমাংসা গ্রহণ করিলে পাপ-পুণ্য, কর্তব্য-অকর্ত্তব্য ইত্যাদি সমুদয় অবস্তু হইয়া উঠে।

মানব জীবনের সারভূত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিমূল যে প্রেম তাহাও উৎপাটিত হইয়া জীবসকল ভ্রমকূপে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম অবলম্বন করত অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়।

যথার্থ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব সাধুগণ এই সকল বন্ধ্যা যুক্তি হইতে জীব সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে বিধান করিয়াছেন। পরমেশ্বর স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা পূর্ণানন্দে অলঙ্কৃত। তাঁহার জীবশক্তির পরিচালনা দ্বারা স্থিতিকালে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিধান করেন, এবং মায়া শক্তির দ্বারা, বস্তুত অসত্য কিন্তু স্থিতিকালে সত্য এই জড় জগৎকে প্রকাশ করেন। জীব চিন্ময় হইয়াও জগদীশ্বরের শক্তি বশতঃ এই জড় জগতে বদ্ধপ্রায় অনুযন্ত্রিত আছেন। পরন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণববর্গ পরমেশ্বরকে এক অদ্বয় তত্ত্ব জানেন, যেহেতু জীব ও জড়ের মূল-স্বরূপ যে দুই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা একমাত্র পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর কদাচ একাধিক নহেন যেহেতু শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যুক্তি, ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান এই চারি প্রকার প্রমাণের দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মকে অদ্বয় বলিয়াছেন।

দ্বিতত্ত্ব ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণও দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ফলত এক পরম তত্ত্বেই তর্কক্লান্ত পরিশ্রমের বিশ্রাম প্রদান করেন। জীব জড় এই দুইটী পদার্থকে তাঁহারা অনাদি ও অনন্ত বলিয়া গীতা প্রমাণ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের গীতার্থ বিবেচনার ত্রুটি বলিতে হইবে যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বয়কে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্বারা ঐ শক্তিদ্বয়ের পরিণাম স্বরূপ কার্য্য সকলকে অনাদিত্ত্বে বরণ করেন নাই। পরিণামের ও পরিণাম হইবার সম্ভাবনা অতএব জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সমুদায় পদার্থ বিনাশ হইতে পারে ইহা সর্ব্বতঃ স্বীকৃত। তটস্থ বিচার করিলে জগদীশ্বর স্বীয় শক্তি গণ হইতে অভিন্ন। যথা আলোক ও দহন এই দুইটী অগ্নির শক্তি কিন্তু ইহারা অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অনাদি ও অনন্ত হইলেও তজ্জাত জীব ও জড় স্বতন্ত্র ভাবে অনাদি ও অনন্ত নহে। অর্থাৎ ইহাদের ক্ষয়োদয় স্বীকার করা যায়। পরন্তু বৈষ্ণবগণ জীব ও জড়কে মিথ্যা বলিতে পারেন না যেহেতু সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর ইহাদের মূল স্বরূপ অতএব মায়াবাদী ভ্রমান্ধ ব্যক্তিগণের মীমাংসা হইতে বৈষ্ণব তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ভিন্ন করিবার জন্য অনেকানেক মহাত্মাগণ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড় এ উভয়কেও নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগদীশ্বর সৃষ্টি করণেচ্ছায় সত্যের সঙ্কল্প করেন একারণ দেবগণ তাঁহাকে সত্যব্রত বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

জড় ও জীব যদিও সত্য তথাপি জগদীশ্বরের স্বীয় সত্যতার সহিত ঐ সাময়িক সত্যের তুলনা হইতে পারে না । যেহেতু পরমেশ্বর নিত্য সত্য, এ প্রযুক্ত দেবতাগণ তাঁহাকে "সত্যপরং" বলিয়া সম্বোধন করেন। সত্যব্রত বলিয়া ভগবানকে সম্বোধন করত দেবতাগণের এরূপ আশঙ্কা হইল যে যদি সত্যব্রত শব্দ দ্বারা ভগবানের সৃষ্ট পদার্থকে নিত্য

সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে মহৎ অপরাধ হইবে; এই আশঙ্কা দূরীকরণ আশঙ্কায় অবিলম্বেই সত্যপরং উপাধিটী প্রয়োগ করিলেন। এই প্রকার ঈশ্বরের নিকট নিরপরাধী হইয়াও দেবতাদিগের সন্তোষ হইল না যেহেতু 'সত্যব্রতং সত্যপরং' এই সঙ্কীর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা কেবল ভগবানই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু অন্যান্য জীবগণ ইহার বিপরীত অর্থ জানিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিবেন অথবা জড় ও জীবকে ঈশ্বরের সহিত নিত্যতার তুলনা করিয়া কলুষিত হইবেন। এই প্রকার চিন্তাকরতঃ ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমেশ্বরকে 'সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে সত্যস্য সত্যং"এই বাক্যের দ্বারা স্তব করিলেন। হে জগদীশ, তুমি সত্যের জননী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ।

অপর তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সাময়িক সত্যে নিহিত হইয়া আছ অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সত্যের সত্য স্বরূপ অর্থাৎ জীবন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিহিত হইয়া আছেন এই ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট অথচ আশ্চর্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ ভাগে পরমেশ্বর আছেন ইহা চিন্তনীয় নহে যেহেতু পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত ও দেশকাল অপরিচ্ছেদ্য। জড়জগতের অতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থকে পরমাণু বলা যায়। প্রতি পরমাণু খণ্ডে পরব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জগদীশ্বর অণু হইতে অণু ও গুরু হইতে গুরু এরূপ বেদসকলও গান করিয়াছেন। বেদসকল পরব্রহ্মের জগতে নিহিত থাকা ভাবকে সুন্দর ব্যক্ত করতে না পারিয়া 'ওতপ্রোত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেহেতু মন ও বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয় সেই অচিন্ত্য ঈশ্বরকে যে কোন বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করা যায় তাহা প্রাকৃতভাবে কলুষিত হইয়া উঠে। কিন্তু জগদীশ্বরের যশঃকীর্ত্তন ও সংস্মরণ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই। এ প্রযুক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বাক্যালঙ্কারে ভগবানকে বর্ণন করুন না কেন ঐ বাক্য সকলের প্রাকৃত ভাবকে পরিত্যাগ করতঃ অপ্রাকৃত ভাব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদিও এই প্রকার প্রতি পরমাণু খণ্ডে জগদীশ্বর পূর্ণরূপে বিরাজ করেন তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বরে আধার আধেয় সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন। অনেকেই নিহিত ভাবের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া ইহাকে বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ভয়ানক মীমাংসাকে নিরোধ করিবার আশায় দেবগণ তাঁহাকে 'সত্যস্য সত্য' উপাধি প্রদান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হইলেও ঈশ্বর নহে।

জগদীশ্বর ইহার সত্য স্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমাপ্ত হইবে তখন ইহার পরিণাম-স্বরূপ পরম সত্য পরমেশ্বর একমাত্র অবশেষ রহিবেন। এই সামরিক সত্যের পর্য্যবসান জগদীশ্বরেই সম্ভব। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং পরমেশ্বর ইহাতে অনুপ্রবেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অপর যখন তাঁহার সেই পবিত্র ইচ্ছা নিরস্ত হইবে তখন ইহার কিছুই থাকিবে না। তখন একমাত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান বিরাজ করিবেন।

এস্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও জীব সকল ছিল না তখন এই বিশ্বের অভাবরূপ একটী অসম্পূর্ণতা ঈশ্বরকে লক্ষ্য হয় অতএব এ স্থলে ত্রিতত্ত্ববাদী মহাত্মাগণ নিজ সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া জীব ও জড়ের নিত্যত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য এরূপ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত নহে।
জীব ও জড়ের প্রাগ্‌ভাব জগদীশ্বরের শক্তি মধ্যে থাকায় তিনি সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন অংশে অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়াবসানে সেই পরব্রহ্মের শক্তি মধ্যে প্রবেশ করিবে। এ স্থলে কালত্রয়ের মধ্যে কখনই তাঁহাকে অসম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রকার কহিতে কহিতে দেবতাগণ বিবেচনা করিলেন যে সত্যই যদি ঈশ্বরের এক মাত্র মাহাত্ম্য হয় তবে তাহা সকলের গ্রাহ্য রূপে সামান্য হইয়া উঠে। আহা! আমরা ঈশ্বরকে এই প্রকার সত্য স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কতদূর অপরাধী হইলাম। এই প্রকার শোচনা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানকে ঋতসত্য নেত্র এই প্রকার সম্বোধন করিলেন। সত্যের সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহার প্রবর্ত্তক অর্থাৎ নিয়ন্তা যে পরম পুরুষ পর ব্রহ্ম তিনিই ভগবান্। ভগবানের শক্তির সমষ্টির নাম ব্রহ্ম যাঁহাকে সত্য উপাধি প্রদান করা হইয়াছে সেই সত্যের আধার যে পুরুষ তিনিই পরমেশ্বর। সেই পুরুষকে সত্য বলিতে হইলে গুণের দ্বারা গুণাধারের নামকরণ হইয়া উঠে। অতএব দেবতাগণ কহিলেন হে সত্যাত্মক! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে যখন গুণ সমুদয় অতিক্রম করত সেই গুণাধার পরম পুরুষের সন্নিকট হইলেন; তখন দেবতাদিগের জ্ঞান একেবারে নিরস্ত হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ভক্তি সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রপত্তিরূপ ভগবচ্চরণামৃত গান করিয়া জ্ঞান শূন্য আনন্দকে প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.২৭

একায়নোসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্ট বিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ॥

দেবগণ জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারা একেবারে স্পন্দহীন কিয়ৎকাল রহিয়া ক্রমে ক্রমে পুনরায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যখন পুনরায় তাঁহা-দিগের স্থূল-দৃষ্টি প্রত্যাগত হইল তখন তাঁহাদের স্বীয় দেহের প্রতি মনোযোগ হইতে লাগিল। ভগবানের মাহাত্ম্য ও স্বীয় ক্ষুদ্রতা আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহারা কহিলেন "অহো! আমরা অতিশয় ক্ষুদ্র যেহেতু আমরা দেহী। দেহীগণ স্বভাবতঃ সীমা বিশিষ্ট কিন্তু পরমেশ্বর অসীম। এই দেহ অথবা সংসাররূপ আদিবৃক্ষ কেবল সপ্ত পঞ্চাশৎ অঙ্গ বিশিষ্ট কিন্তু পরমেশ্বর অনন্ত। মায়া প্রকৃতিই ইহার একমাত্র অয়ন, সুখ ও দুঃখ ইহার দুইটি ফল, সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ ইহার তিনটি মূল, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ইহার চারিবিধ রস, শ্রোত্র-স্পর্শ-চক্ষু-জিহবা-নাসিকা এই পাঁচটী ইহার জ্ঞানাগম প্রকার, শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু-ক্ষুধা-পিপাস ইহার ছয়টী স্বভাব, ত্বক্-অসৃক্-মাংস-মেদ-অস্থি-মর্জ্জা-শুক্র ইহার ত্বক্ স্বরূপ, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম-মনঃ-বুদ্ধি-অহঙ্কার ইহার বিটপ স্বরূপ, নবদ্বার ইহার ছিদ্র, দশ প্রাণ (অপানাদি) ইহার পত্র, জীব ও পরমাত্মা ইহার দুইটী পক্ষী। এবম্বিধ দেহ বিশিষ্ট জীব কি প্রকারে অহঙ্কার করিতে পারে? দশ প্রাণ পর্য্যন্ত যে দেহের প্রাকৃত বিভাগ তাহাতেই মূঢ় লোকেরা আত্মবুদ্ধি করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একমায়া হইতে দশ প্রাণ পর্য্যন্ত এই দেহকে ক্ষুদ্র ও অনিত্য বোধ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ পক্ষীদ্বয়কে আলোচ্য জানিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন তাঁহারাই স্বস্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন এরূপ বলিতে হইবে। এই দেহের সম্বন্ধে জীব একটী পক্ষী বিশেষ যেহেতু এই বৃক্ষের সহিত জীবের স্থায়ী সম্বন্ধ নহে। পক্ষীগণ যেরূপ রাত্রি যাপন করিবার জন্য একটী বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরে প্রভাত হইবামাত্র স্থানান্তরে গমন করে জীবও তদ্রুপ এই সংসাররূপ দেহকে অবলম্বন পূর্ব্বক বদ্ধভাব নিশাবসানে অপ্রাকৃত ধামে গমন করিয়া থাকে। অতএব যে সকল ব্যক্তি এই সংসার রূপ বৃক্ষকে স্বীয় সম্পত্তি বোধ করত কেবল প্রাকৃত পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে ব্যস্ত হয় তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। প্রাকৃত তত্ত্ববাদীগণ যে প্রকার পরিশ্রম করিয়া থাকেন তদুপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হন না। প্রকৃতি গুণময়ী, অতএব তাহার গুণ সকল ও গুণ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদিগের পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে কোন প্রকার নিত্যলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার উপদেশের দ্বারা প্রাকৃত তত্ত্ব জঘন্য এরূপ কহা যায় না যেহেতু তত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অপ্রাকৃত তত্ত্বাবিষ্কারের পক্ষে অনেক উপকার করিয়াছেন ও করিবেন। জীব যত কাল জড় দেহে আবদ্ধ থাকিবে ততদিবস তাহার পক্ষে অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা সুকঠিন।

জড় দেহের গুণ সকল আলোচনা করিতে করিতে মনের ভাবসকল উদয় হয়, একারণ মানবগণের কল্পনা বিভাবনারূপ সমুদয় চিন্তা প্রকৃতি-মূলক অতএব অপ্রাকৃত হইতে পারে না। চিচ্ছক্তির পরিণাম স্বরূপ অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধামের উপলব্ধি ব্যতীত জীব আর কিছুই বুঝিতে পারে না। পরমার্থ ব্যাকুল মহাত্মাগণ কেবল মাত্র উপলব্ধিতে আবদ্ধ থাকা ক্লেশকর বোধ করিয়া ঐ সমস্ত নিত্যধামের নানাবিধ বিভাবনা করিয়াছেন। কিন্তু তৎসমুদয়ই প্রাকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। প্রাকৃত তত্ত্ববাদীগণ প্রকৃতির গুণ ও সম্বন্ধ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আবিষ্কার করায় অপ্রাকৃত তত্ত্ববেত্তার যদিও কোন সাক্ষাৎ উপকার হয় না তথাপি গৌণ উপকার হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি সকল কহিয়াছেন যে ‘তন্ন তন্ন’ করিয়া অবশিষ্ট যাহা পাওয়া যাইবেক তাহাই অপ্রাকৃত তত্ত্ব। অতএব প্রাকৃত তত্ত্ববাদী যে প্রাকৃত গুণের আবিষ্কার করিবেন তাহা অপ্রাকৃত নহে এইরূপ স্থির করিতে করিতে অবশেষে যাহা পাওয়া যাইবেক তাহাই নিশ্চয় অপ্রাকৃত। বদ্ধ সংস্কার জনিত অনেকানেক ভাব নিচয়কে অনেকেই অপ্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু যখন প্রাকৃত তত্ত্ববাদী ঐ ভাব সকলকে প্রাকৃত বলিয়া স্থাপনা করিয়াছেন, তখন অপ্রাকৃত তত্ত্ববিৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। এই প্রকারে প্রাকৃত তত্ত্ববাদী হইতে অপ্রাকৃত তত্ত্ববাদী অনেক গৌণ উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন স্বীকার করিলে প্রাকৃত সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা যায় না বরং শ্রদ্ধা করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রাকৃত তত্ত্ববেত্তারা অনেকেই পাষণ্ডতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রাকৃত তত্ত্বাবিষ্কারকেই পরম বলিয়া জানেন। উহার যথার্থ উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। ফলতঃ মূঢ়তাই, তাঁহাদের পক্ষে ফল স্বরূপ হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক পরমাণু হইতে সমস্ত জগৎ সৃজন করত উহার গুণ সমষ্টিকে পদার্থপদে ব্যাখ্যা করেন। কোন কোন পরিণামবাদী পরমাণুতেও শান্তি প্রাপ্ত না হইয়া একমূলা অন্ধকাররূপিণী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই প্রকার কেহ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কেহ নবতত্ত্ব, কেহ দ্বিপঞ্চাশৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সমস্ত সংশয়ের মীমাংসা হওয়া স্বীকার করত নিশ্চিত হন।

এই প্রকারে প্রাকৃত তত্ত্ববাদী হইতে অপ্রাকৃত তত্ত্ববাদী অনেক গৌণ উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন স্বীকার করিলে প্রাকৃত সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা যায় না বরং শ্রদ্ধা করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রাকৃত তত্ত্ববেত্তারা অনেকেই পাষণ্ডতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রাকৃত তত্ত্বাবিষ্কারকেই পরম বলিয়া জানেন। উহার যথার্থ উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। ফলতঃ মূঢ়তাই, তাঁহাদের পক্ষে ফল স্বরূপ হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক পরমাণু হইতে সমস্ত জগৎ সৃজন করত উহার গুণ সমষ্টিকে পদার্থপদে ব্যাখ্যা করেন। কোন কোন পরিণামবাদী পরমাণুতেও শান্তি প্রাপ্ত না হইয়া একমূলা অন্ধকাররূপিণী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই প্রকার কেহ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কেহ নবতত্ত্ব,

কেহ দ্বিপঞ্চাশৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সমস্ত সংশয়ের মীমাংসা হওয়া স্বীকার করত নিশ্চিত হন। আহা! কি খেদের বিষয় যে জগতের সমস্ত পদার্থের আবিষ্কার করিয়াও ঐ সকল বিপথগামী তত্ত্বতৃষুগণ আমি কোন্ ব্যক্তি, আমার পরিণাম কি, ও তৎপরিণামের উপায় কি এইরূপ স্বরূপ চিন্তার বিষয়ে চিরকাল অজ্ঞ রহিলেন। আকাশস্থ বিদ্যুৎ ও জল মধ্যস্থ প্রবাল ও ভূগর্ভস্থ ধাত্বাকর প্রভৃতি সমুদয় পদার্থের যিনি নির্ণয় করিলেন তিনি আপনাকে জানিতে পারিলেন না। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি কখন মৃত্তিকাদির পরিণাম, কখন বানরাদির বংশাবলী বলিয়া মানব আত্মাকে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বানরের বংশাবলী বলিয়া আপনাকে যাঁহারা অপদস্থ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে দ্বিবিদ বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞ ভগবদ্দাস জীবের মূল স্বরূপ সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক ঐ সকল দ্বিবিদ গণের সংহার হইয়া থাকে। অন্ধকার বলিয়া মূল প্রকৃতিকে যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারা মায়া প্রকৃতিকে নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু মায়া প্রকৃতি যদিও সংসাররূপ বৃক্ষের মূল তথাপি জীব শক্তির মূল হইতে পারে না। জীব শক্তি একটী স্বতন্ত্র শক্তি উহা পক্ষীর ন্যায় ঐ মায়া প্রসূত সংসার বৃক্ষের কোটরে কিয়ৎকালের জন্য বাস করিতেছে। জীব আলোক স্বরূপ অতএব অন্ধকারের পরিণাম হইতে পারে না। এই মায়া শক্তিই অন্ধকাররূপে এই সংসার বৃক্ষের একমাত্র আশ্রয়। অতএব ইহাকে একায়ন উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। সুখ ও দুঃখ এই দুইটী ইহার ফল। পার্থিব সমস্ত সুখই দুঃখের ন্যায় নিরানন্দময় সুখের চরম ভাবকে স্বর্গ বলা যায়। ঐ স্বর্গও প্রাকৃত যেহেতু পারিজাত ঘ্রাণ, অপ্সরা নৃত্য, গন্ধর্ব্ব গীত, নন্দন কানন ও ইন্দ্র সভা দর্শন ও অস্পরা দিগের অঙ্গ স্পর্শন, অমৃত পান ইত্যাদি যত প্রকার সুখের উল্লেখ আছে তাহাও ইন্দ্রিয়জনিত। ইন্দ্রিয় সকল দেহের উপলব্ধির দ্বার অতএব দেহের সহিত অনিত্য। শত বর্ষের উচ্চ স্বর্গ সুখ একত্র করিলেও এক বিন্দু অপ্রাকৃত সুখের তুল্য হইতে পারে না। অসুতৃপ ব্যক্তিগণ যে ইন্দ্রিয়সুখকে পরম করিয়া জ্ঞান করে সে কেবল তাহাদের অপ্রাকৃত ভক্তি সুখের অজ্ঞতাবশতঃ বলিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সুখ অনিত্য ও ভয়জনক কিন্তু অপ্রাকৃত সুখ নিত্য ও বিমলানন্দ পূর্ণ। পশুগণ যেরূপ অপ্রাকৃত সুখের অজ্ঞতা প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়সুখকে শ্রেষ্ঠ জানে, তদ্রুপ দ্বিপাদ পশুগণ ও অপ্রাকৃত মুখের ভৌক্তা গণকে উন্মাদ বোধ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় সুখানুভবে দিনপাত করে। প্রাকৃত সুখ মরীচিকাবৎ ভ্রমজনক। যত দিবস ঐ সুখের বিষয়টী হস্তগত না হয় তত দিবস উহাতে যে পরম সুখ আছে এ প্রকার বোধ হয় কিন্তু ঐ সুখভোগ করিবার পর ভয়ানক নিরানন্দ আসিয়া আত্মাকে আক্রমণ করে।

প্রাকৃত সুখ ও প্রাকৃত দুঃখ দুই তুল্য। সংসার বৃক্ষের তিনটী মূল অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তম। অপেক্ষাকৃত সমুদয় উত্তমগুণ গুলিকে সত্ত্বগুণ কহা যায়,

মধ্যমগুণ গুলিকে রজোগুণ ও অধমকে তমোগুণ কহা যায়। পালন, স্থিতি, দয়া, ধর্ম্ম, বিচার প্রভৃতি সত্ত্বগুণের লক্ষণ। সৃষ্টি স্বর্গাভিলাষ যুক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও প্রাকৃতাপ্রাকৃত ধর্ম্ম সকলে মিশ্রিত বোধকরণ প্রভৃতি অনেকানেক রজোগুণের লক্ষণ আছে। ভয়ঙ্কর ঈশ্বর বিরোধী ক্রিয়া সকল উন্মত্ততা, পাপকে পুণ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা, সংহার, কৃতঘ্নতা প্রভৃতি তমগুণের সৈন্যনিচয় বলিয়া জানা যায়। এই তিনটী গুণই সংসারের মূল স্বরূপ। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারিটী এই বৃক্ষের রস। "মানবগণ এই সংসারে কখন ধর্ম্মের কখন অর্থের কখন কামনার, কখন মোক্ষের আস্বাদন করিয়া থাকেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক যে সকল মনুষ্যের স্বর্গাদি ফল পাইবার জন্য শ্রাদ্ধ তর্পন, দুর্গোৎসবাদি দেবতা পূজা, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, ও পুরশ্চরণাদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন তাঁহারা আর্য্য প্রণীত ধর্ম্মের আস্বাদন করেন। পৃথিবীতে সার্ব্বভৌম পদ ও স্বর্গে নানা প্রকার সুখ ভোগকে অর্থ বলে। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণের পদবাঞ্ছাকে কাম কহে। এই সমুদয় প্রাকৃত সুখের আশাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বার্থপরতার সহিত স্বীয় আত্মাকে জগদীশ্বরের অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য স্বরূপ পরব্যোমধামে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, ও সারূপ্যরূপ মুক্তিতে নীত করণেচ্ছায় যাঁহারা ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বরকে সাধনা করেন তাঁহারা মোক্ষ রসকে ভোগ করেন। তদ্ব্যতীত সাযুজ্যরূপ মোক্ষ বাসনায় অনেকানেক ব্যক্তি জ্ঞানযোগদ্বারা পরব্যোমের বহির্ভাগস্থিত এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলকে প্রাপ্ত হন। তথায় জগদীশ্বরকে নিরাকার জ্ঞানবশত দৃষ্টি করিতে না পাইয়া সোহং ভাবে আপনাকে ব্রহ্ম বোধ করত স্বীয় ক্ষুদ্রাত্মার মধ্যে যে কিছু ক্ষুদ্র রস আছে তাহাকেই ব্রহ্মানন্দ ভাণ করিয়া চুষিতে থাকেন কিন্তু অতিশীঘ্র ঐ রসে তৃপ্ত হইয়া পুনরায় কামনা বশত সংসার গতি প্রাপ্ত হন।

সংসার মধ্যে পঞ্চবিধ প্রাকৃত জ্ঞানপ্রকার। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, ও রসনা ইহারাই প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞান মনোরূপে আত্মার সহিত সংযোগ করে। এই পঞ্চদ্বার হইয়া যে জ্ঞান আত্মার নিকটস্থ হয় ইহাকে সামান্য লোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ বোধ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শকে বিষয়ানুভব বলা যায় ও তদন্তরে চিত্তের দ্বারা বিষয়ের প্রতিভা মনস্থ হইলে বিষয়োপলব্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চগুণ ও তাঁহাদের মিশ্রভাবই মনের বিষয় এই সমুদায় রূঢ়ি প্রতিবিম্ব হইতে মানবগণ বিভাবনা শক্তির দ্বারা অদৃষ্ট স্বর্ণ পর্ব্বতাদি ও ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃত লোক কল্পনা করিয়া থাকেন। এই বিভাবনা শক্তির অনুকল্প বিকল্প রূপ দুইটী গতি আছে। অনুকল্প গতিদ্বারা সমষ্টি হইতে ব্যষ্টি নির্ণীত হয় অর্থাৎ সাধারণ শ্রেণী হইতে বিশেষ বিশেষ রূঢ়ি পদার্থ পৃথক্ কৃত হয়। যথা জীবরূপ সমষ্টি হইতে উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি ব্যষ্টি পৃথকরূপে পরিদৃশ্য হয়। বিকল্পগতির দ্বারা ব্যষ্টি সমুদয়ের সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া

ঐ সমুদায় কোন এক সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়। এই প্রকার বিভাবনা শক্তির যে নির্ণয়াকারী সৌন্দর্য্য তাহাকে যুক্তি কহা যায়।

এই যুক্তি শক্তির দ্বারা জীবের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই ঘটিবার সম্ভব। জীব যখন ঐ শক্তির দ্বারা সমুদয় প্রাকৃত পদার্থে অনিত্যতা দৃষ্টি করেন তখন উহা কর্ত্তৃক মঙ্গল হয়, কিন্তু যৎকালে ঐ শক্তির দ্বারা উহার অগোচর অপ্রাকৃত পদার্থকে নির্ণয় করিতে ব্যস্ত হন তখন তিনি মূঢ় পদবাচ্য হইয়া উঠেন। যুক্তি যখন সমুদয় বিচার আলোচনা পূর্ব্বক জীবের অপ্রাকৃত বিভাগের জীবন স্বরূপ অচ্যুত বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তখন উহার প্রকৃত কর্তব্য অনুষ্ঠিত হয়।

শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু-ক্ষুধা-পিপাসা ইহারা প্রাকৃত দেহের স্বভাব, আত্মার নহে। হতভাগ্য নাস্তিকগণ আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন না। শোক ও মোহ যদিও আত্মায় সম্ভবে না তথাপি দেহাত্মাভিমানী ব্যক্তিগণ উহাদের কর্তৃক আত্মার পীড়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

পঞ্চভূত এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই দেহ বৃক্ষের বিটপ। আত্মার বিষয় ধ্যানকে মন কহা যায়। বুদ্ধির অন্যতম নাম বিষয় জ্ঞান। দেহে আত্মাভিমানকে অহঙ্কার কহিয়া থাকে।

এই সমুদয় প্রাকৃত পদার্থময় সংসাররূপ আদিবৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থিতি করেন ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.২৮

ত্বমেক একস্য সতঃ প্রসূতিঃ ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।

ত্বম্মায়য়া সংবৃতচেতসত্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥

পূর্ব্বশ্লোকে সংসাররূপ আদিবৃক্ষকে ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ এক্ষণে কহিতেছেন "হে সর্ব্বকারণকারণ! এই সংসাররূপী বৃক্ষের তুমি একমাত্র উপাদান কারণ। তোমা হইতে অর্থাৎ তোমার মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্ব সংসার উৎপত্তি হইয়া তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে এবং অবশেষে তোমাতেই ইহার পর্য্যবসান হইবে। তুমিই রজোগুণে অবস্থিতি করত সৃষ্টি করিয়া থাক এবং সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠান করত পালন করিয়া থাক এবং তমোগুণে আবির্ভাব হইয়া সংহার কর কিন্তু তোমার মায়াদ্দ্বারা সংবৃত চিত্ত পুরুষেরা তোমাকে অনেক দেবতারূপে দৃষ্টি করেন। পরন্তু যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা তোমাকে অদ্বয় বস্তু বলিয়া স্থির করেন।

এই জ্ঞান গর্ভ বাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরমেশ্বর এক পদার্থ। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত পুরুষ এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা। যাঁহারা নানাবিধ দেবতা কল্পনা করিয়া জগদীশ্বরের ভেদজ্ঞান উপস্থিত করেন তাঁহারা ঈশ্বর তত্ত্ব কিছুই জানেন না। তবে যে জগতে নানাবিধ উপাসনা প্রণালী দৃষ্ট হয় তাহার কারণ চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণান্বিত উপাসনার একমাত্র প্রণালী অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.২৯

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥

দেবগণ কহিলেন হে বিভো! তুমি জ্ঞান স্বরূপ আত্মা চরাচরস্থিত লোকসকলের প্রতি কৃপা করিয়া তুমি নানারূপে প্রতিভাত হও অর্থাৎ সৎলোকের প্রতি তুমি সত্ত্বোপপন্ন আনন্দপ্রদরূপসকল ধারণ কর এবং খল লোকের পক্ষে সর্ব্বদাই অভদ্রমুর্ত্তি দেখাইয়া থাক।

এই অপূর্ব্ব বাক্যের দ্বারা দেবতাগণ ঈশ্বরের আত্মারাম অবতারের ব্যাখ্যা করিলেন। সমুদয় সৃষ্ট পদার্থে পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর প্রবেশ করিয়াছেন। সমস্ত ভূত সকলে ও সকলশ্রেণীবর্গে জগদীশ্বরের প্রতিভা আছে। পরমেশ্বর অখিল জগতের ও জীবগণের প্রাণের প্রাণ-স্বরূপ অতএব তাঁহার পরমাত্মা অবতার সমুদয় পদার্থে না থাকিলে সকলই অপদার্থ হইত। জগতে যতগুলি পৃথক পৃথক বস্তু আছে সেই সমুদয়ে ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবান গর্ভোদকশায়ী পরমাত্মা রূপে বিরাজমান করিতেছেন। ফলত বস্তু সকলের পৃথক্ত্ব হেতু পরমাত্মার পৃথক্ পৃথক্ রূপ প্রতিভাত হইয়াছে। যে আধারে যে সমুদায় গুণ আছে তদনুযায়ী ঈশ্বরের রূপ বিকল্পিত হয়। জড় জগতে অচিন্ত্য কৌশল দৃষ্ট হয় অতএব কৌশলের চিহ্ন-স্বরূপ চক্রধারী ভগবান উহাতে প্রতিভাত হইয়াছেন। যে সকল ব্যক্তিগণ আত্মপ্রত্যয় রূপ অচ্যুত বিশ্বাসকে স্থান দান করেন না তাঁহারা যুক্তি দ্বারা চক্রধারী ভগবানের স্বরূপ দেখিতে পান। তাঁহারা অনন্ত অবতারের রূপ সমুদয় বিচার করিতে সমর্থ হন না। তদ্রূপ জগতে যতগুলি জীব আছে তাহাদের আত্মায় পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হন। বাহ্যাকারে যে রূপ দেহ সকল ভিন্ন ভিন্নাকারে ন্যস্ত, আত্ম-স্বরূপ জীবসকলও ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি প্রমাণ করত ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও গুণে অবস্থিত আছেন। ঐ সকল স্বভাব ও গুণের স্বরূপ অনুযায়ী আত্মারাম পরমাত্মার ও ভিন্নরূপ বিবেচিত হয়। অতএব জগতে যতগুলি জীব আছে ঈশ্বরের তত প্রকার অবতার স্বীকৃত হইল। সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিগণের আত্মায় ঈশ্বরের সত্ত্বগুণান্বিতরূপ দৃষ্ট হয়। তদ্রুপ যাহারা রজোগুণান্বিত তাহারা রজোগুণান্বিত ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পায়। তমো গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে তামসিকরূপে দৃষ্টি করে। এই প্রকার গুণ সকলের অনুলোম বিলোম জনিত অনন্ত প্রকার গুণের সম্ভাবনা সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিভাত রূপ সকলও অনন্ত প্রকার। জীব সকল নিজ নিজ গুণাধিষ্ঠিত ঈশ্বর মূর্ত্তির আরাধনা করে। এই প্রকার আরাধনা করিলে তাহাদের নিজ নিজ গুণের সমৃদ্ধি হইয়া তাহার চরম ফল প্রাপ্ত হয়। তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের তমোগুণান্বিত কোন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির আরাধনা করত তাহার চরম ফল-স্বরূপ ভয় প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ সত্ত্বগুণান্বিত মূর্ত্তির সেবা করত জীবের কল্যাণ-রূপ

বিশুদ্ধ সত্ত্বময় প্রেম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান জগতের জীবন স্বরূপ হইয়া যদিও অনন্তরূপ ধারণ করেন তথাপি জীবগণ তটস্থ বিচার পূর্ব্বক ভগবানের স্বস্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া পরব্যোমস্থিত শিবত্ব প্রাপ্ত হন। তমোগুণ-প্রচুর খল সকল ভগবানের অভদ্ররূপ প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডিত হয়।

এ স্থলে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, ভগবানের যে প্রকারে হউক উপাসনা হইলেই জীবের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু ভগবান সূর্য্যস্বরূপ, অতএব তম-স্বরূপ অমঙ্গলের সান্নিধ্যমাত্র তিরোহিত করিতে সমর্থ হন। এই সন্দেহটা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। জীবের স্বাধীনতাই ভগবানের অবতারের জনক। জীবের নিত্যস্বভাব কি ইহাই বিচার করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর পারতন্ত্র্যই জীবের নিত্য স্বভাব, যেহেতু জীব স্বভাবতই কৃষ্ণদাস। জীবের মঙ্গল সাধনার্থে অর্থাৎ প্রলোভন দ্বারা বলীয়ান্ করণার্থে পরমেশ্বর স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের কণামাত্র জীবকে দেখাইয়াছেন। যেসকল জীব দুর্ব্বল তাহারা স্বতন্ত্রের চাকচিক্যে ভ্রান্ত হইয়া পরতন্ত্ররূপ নিজ স্বভাবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বতন্ত্রতাতে লোভ করত মায়ার গুণ সকলকে অবলম্বন করিলেন। এই স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করাতে মায়াদত্তগুণ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমুদয় জীব ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু যেসকল জীব বলবান তাঁহার স্বতন্ত্রতাকে অগ্রাহ্য করায় কৃষ্ণদাসত্ব স্বরূপ স্বস্বভাবে রহিলেন। তাঁহাদের কখনো পতন হয় নাই, এজন্য তাঁহাদিগকে নিত্যমুক্ত কহা যায়। যাঁহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক মায়িক গুণ স্বীকার করিলেন তাঁহারা বদ্ধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। নিত্যমুক্ত পুরুষেরা পরমেশ্বরের নিজরূপের মাধুর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহার অপ্রাকৃতধামে সেবকত্ব প্রাপ্ত হইয়া আছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা অবতার বিষয় জ্ঞাত নহেন। বদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষেই ঈশ্বরের অবতার। ঈশ্বরের গুণাবতার সকলকে সুতরাং বদ্ধ-পুরুষেরা উপাসনা করিয়া গুণাধিষ্টিত ফল প্রাপ্ত হন। অতএব জীবের স্বতন্ত্রতাই অবতারের কারণ বলিতে হইবে যেহেতু জীব যদ্যপি স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া মায়া-গুণ অঙ্গীকার না করিতেন তবে আত্মারামের ভিন্ন ভিন্ন অবতার হইত না। এ প্রযুক্ত বেদান্তশাস্ত্রে প্রকৃতিকে স্বক্রিয় বলিয়া ঈশ্বরকে নির্ব্বিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে জীব নিজ স্বতন্ত্র কর্ম্মফলে আপনার বদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদিও বিচার-পূর্ব্বক কর্ম্মফলই অবস্থার কারণ বলিতে হইবে ঐসমস্ত বিচারে বিশেষ মীমাংসা না হওয়ায় এতৎ সমুদয় ঈশ্বরের লীলা বলিয়া গৃহীত হয়। জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান অতএব জীবের মঙ্গলার্থে অমঙ্গল-রূপ স্বতন্ত্রতা কি প্রয়োজনে প্রদান করিয়া কতগুলি জীবকে মায়াবদ্ধ করিয়াছেন ইহা স্থির করা অসাধ্য। শ্রীচৈতন্যদেব এই চিন্তাকে অসাধ্য ভ্রম কহিয়া ইহা হইতে বৈষ্ণবদিগকে নিরস্ত হইতে উপদেশ করিয়াছেন। বস্তুত প্রভু-আজ্ঞাই প্রবল যেহেতু তাহা অতিক্রম করিলে বন্ধ্যাতর্কে প্রবেশ করিতে হয়।

এই স্বতন্ত্রতা যদিও জীবের অনেক অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে তথাপি প্রভু ইহাকে ঈশ্বরের মঙ্গলময় দান বলিয়া রামানন্দের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে সমুদায় জীব এই স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াও ঈশ্বর পারতন্ত্র্যের অনুগামী থাকিতে পারিলেন তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা ভগবানের অধিক প্রিয়তর হইলেন। অতএব মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে, জীবসকল ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বতন্ত্রতার উচিত ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন। স্বতন্ত্রতা না থাকিলে জীবের ঈশ্বর-পারতন্ত্র্যে অগত্যা থাকিতে হইত অতএব তাহাতে জীবের মাহাত্ম্য ছিল না। যে সকল জীব স্বাতন্ত্র্যের বশীভূত হইয়া বদ্ধপ্রায় জগতে বিচরণ করিতেছেন তাঁহারা মায়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল গুণোদ্ভাবিত ভগবানের নানা প্রকার প্রতিভার সেবা করেন, কিন্তু ঐ সকল সেবার দ্বারা ভগবৎসেবা হয় না যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন রূপের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের মুখ্য সেবাই প্রেম, একারণ যাঁহারা তামসিক মূর্ত্তি সকলের ভয়, ঘৃণা ও লম্পটতা দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন তাঁহারা শান্তি হইতে দূরীকৃত হন। যদিও ভগবান্ কোন না কোন রূপে তাঁহাদের সহগামী হইয়া নরকেও অবস্থিতি করেন তথাপি তাঁহাদের প্রেম অভাবে মঙ্গল হইতে পারে না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী, অতএব জীব যে গতিতে যেখানেই থাকুক ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতে পারে না, কিন্তু শান্তির মুখ্য উপায় যে অহৈতুকী ভক্তি তাহা যতকাল জীবের আশ্রয় না হয়, ততকাল জগদীশ্বরের ভীষণমূর্ত্তি ব্যতীত শান্তমুর্ত্তির দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য জীবের তটস্থ বিচার দ্বারা সত্ত্বোপপন্ন শান্তমূর্তির ধ্যান ও সেবা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। স্বতন্ত্রতা জনিত জীবের যে বদ্ধত্ব তাহাও ঐ সত্ত্ব গুণের সেবার দ্বারা ঘুচিবার সম্ভাবনা।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩০

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনা বেশিত চেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥

এই প্রকার অনন্ত অবতারের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণান্বিত যে ভগবদ্বপু তাহাই জীবের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনের বিষয় ইহা নিশ্চয় করিয়া দেবগণ কহিলেন হে অম্বুজাক্ষ! বিবেকী পুরুষগণ সমাধিযোগে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধামস্বরূপ তোমাতে চিত্ত নিবেশিত করিয়া মহৎ লোকের কৃত তোমার পাদপদ্মকে তরীর ন্যায় জ্ঞান করত ভবসাগরকে গোবৎস পদ করিয়া পার হইয়া থাকেন।

অম্বুজাক্ষ নামে এই স্থলে ভগবানকে সম্বোধন করার অনেক অভিপ্রায় আছে। ভগবান্ অখিল জগতের দ্রষ্টা, তাঁহাকে কেহই দৃষ্টি করিতে পারে না। তিনি সকলের সাক্ষী অতএব কেহই তাঁহাকে যুক্তি অথবা বিচারের দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় না। তবে যে কেহ তাঁহার শান্ত মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিবে সে কেবল স্বীয় আত্মার তৃপ্তি ব্যতীত ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ বলিতে পারিবে না। ভগবানের জ্ঞানস্বরূপকে চক্ষুর সহিত তুলনা করিয়া উহার প্রেমময় লক্ষণের ব্যাখ্যার্থে পদ্মের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সচ্চিদানন্দভাবই তাঁহার পদ্মলোচন। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত বপুর ব্যাখ্যায় তাঁহার সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকে প্রথমে উল্লেখ করার প্রয়োজনে তাঁহাকে অম্বুজাক্ষ বলিয়া দেবতারা সম্বোধন করিলেন।

বিশুদ্ধ সত্ত্বধামের প্রকৃত অর্থ বিচার করা বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু উহাই তাঁহাদের প্রাপ্য। প্রথমত মায়াতে যে তিনটী মূল গুণের দৃষ্টি হয় তন্মধ্যে সত্বগুণই শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃত জগতের উৎকৃষ্টাংশকে সত্ত্বগুণ বলা হয়। যে সকল লোক প্রাকৃতভাবে আবদ্ধ তাহারা প্রথমে সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করত রজ ও তম গুণকে জয় করিবেক। কিন্তু সত্ত্বগুণই যে চরম এমত নহে যেহেতু তাহাতেও প্রাকৃতভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্রতা, দয়া, বিচার, জ্ঞান, নিষ্পাপ সুখ, জনসঙ্গলিপ্সা, প্রার্থনা, সদালোচনা, উপকার, বৈষ্ণব-সংসার, বৈষ্ণব সেবা, দেহ, মন প্রভৃতির উন্নতি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি অনেক সাত্ত্বিক ব্যবহার আছে কিন্তু এ সমুদয়ই প্রাকৃত। ভৌতিকভাবের সহিত যাহা কিছু আবদ্ধ আছে তাহাই প্রাকৃত। সাংসারিক কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদয়ের যত আলোচনা হইয়া থাকে সমুদয়ই ভৌতিক।

পীড়িত লোককে ওষধিদান যদিও দয়ার কার্য্য তথাপি ঐ দয়া ভৌতিক উপকার ব্যতীত তদ্দ্বারা আর কিছুই করিতে সমর্থ হয় না। ভৌতিক কার্য্যের নির্গুণ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই যেহেতু কর্ম্মানুযায়ী ফল হইয়া থাকে। আকৃতি, বিস্তৃতি, আকর্ষণ, স্থিতি-স্থাপকতা প্রভৃতি ভৌতিক বিষয়ের গুণ। কিন্তু আত্মা যে কি পদার্থ তাহা বিচার করিতে হইলে ভৌতিক গুণ সকল হইতে বিচারকে প্রথমে নির্ম্মল করা প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যত দিবস মানব, দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখেন ততদিবস তাঁহার অভৌতিক ভাবের নির্ম্মল প্রকাশ সম্ভবে না; এ বিধায় সত্ত্বগুণই বিশেষরূপে সেব্য। কিন্তু তাহাই যে জীবের পক্ষে প্রাপ্য তাহা নহে। সমুদয় গুণ সকলের বিপরীত অবস্থাকে অপ্রাকৃত তত্ত্ব কহা যায়। মানব যখন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর প্রতি অপ্রাকৃত তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, গুরু তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভাব বিসর্জ্জন দিতে অনুমতি করিয়া থাকেন। এই জন্য গুরু কহিয়া থাকেন যে, হে শিষ্য তুমি স্বয়ং অপ্রাকৃত নির্গুণ ও ঈশ্বর দাস এবং জগদীশ্বর অপ্রাকৃত নির্গুণ ও প্রভু। শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার এবং ঈশ্বরের আকার কি প্রকার এবং আমরা কোথায় অবস্থিতি করি। গুরু এই স্থলে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া ভৌতিক ভাব নিষেধ করিবার জন্য কহিয়া থাকেন "তুমি ও পরমেশ্বর উভয়েই নিরাকার অতএব তোমাদের স্থানের প্রয়োজন নাই।" শিষ্য প্রথমে অত্যন্ত কষ্টের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে দেখিতে পান যে আত্মতত্ত্ব সমুদয় ভৌতিক তত্ত্বের বিলক্ষণ কিন্তু অবস্তু নহে। মন আত্মবস্তুকে সন্ধান করিতে পারে না যেহেতু ইন্দ্রিয়জনিত ভাবনিচয় কর্ত্তৃক মনের গঠন হইয়াছে। আত্ম বস্তু অতীন্দ্রিয় ও গুণাতীত ও মন কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে গেলে ব্যভিচার দোষে দূষিত হয়। কিন্তু আত্মবস্তু যে কি ইহা জানা কর্ত্তব্য এবং কোন বৃত্তিদ্বারাই বা উহা জানা যাইতে পারে। এই প্রকার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি পুনরায় গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকেন হে গুরো! আপনি কহিয়াছেন যে আত্মা নির্গুণ ও নিরাকার তবে জীব কি প্রকারে স্বীয় আত্মা ও আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং গুণাভাবে উপলব্ধি অসম্ভব অতএব ভৌতিক জগত হইতে জীবের স্বস্বরূপে অধিষ্ঠান কি রূপে হইতে পারে। গুরু দেখিলেন যে শিষ্য এই সময়ে আত্মতত্ত্ব জানিবার যোগ্য হইয়াছেন যেহেতু তিনি ভৌতিক ভাব সকলকে বিশেষরূপ অবগত হইয়া অভৌতিক ভাবের অনুসন্ধান করিতেছেন। গুরু আহ্লাদ পূর্ব্বক কহেন যে, "হে উপযুক্ত শিষ্য তোমাকে যে নির্গুণ ও নিরাকার এই দুইটী শব্দ কহিয়াছিলাম তাহার অর্থ এই যে আত্মা ও পরমেশ্বর ভৌতিক সমস্ত ভাবের অতীত কিন্তু অবস্তু নহেন, যেহেতু প্রাকৃতাতীত পদার্থ হইলে অপ্রাকৃত শব্দ বাচ্য হয়। আত্মা ও পরমেশ্বরে অপ্রাকৃত গুণ সকল আছে তন্মধ্যে জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় জ্ঞান ও আনন্দ এই দুইটীই প্রত্যক্ষ। আত্মা প্রাকৃত জগতে দ্রষ্টা অতএব চক্ষু যেমত সমুদয় পদার্থ দৃষ্টি করিয়া আপনাকে আপনি দেখিতে সমর্থ হয় না তদ্রূপ আত্মা ও আপনাকে আপনি দেখিতে পায় না। চক্ষু-দৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান ও তদুদঘাটিত আনন্দস্বরূপ আপনাকে জানে তদ্রূপ আত্মা ও সর্ব্বদৃক্ হইয়া স্বীয় জ্ঞান ও আনন্দকে অনুভব করে। এই অনুভবটীই আত্মার প্রত্যক্ষ। বস্তুত জ্ঞানানন্দই যে আত্মা ইহা অনুভূত হয়। পরমেশ্বর ঐ জ্ঞানানন্দের পূর্ণ স্বরূপ। অতএব হে শিষ্য, তোমাকে পূর্ব্বে যে নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়া কহিয়াছিলাম তাহার বাস্তবিক অর্থ এই যে,

তুমি এবং ঈশ্বর নির্ম্মল জ্ঞান ও নির্ম্মলানন্দ গুণ বিশিষ্ট। তোমরা বাস্তবিক নিরাকার ও নির্গুণ নহ কেবল অপ্রাকৃত আকার ও অপ্রাকৃত গুণে তোমার বিচারকে আনিবার জন্য এরূপ কহিয়াছিলাম। তুমি অতিশয় ভাগ্যবান যেহেতু আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া পরমতত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইলে। তুমি যদি মূর্খ হইতে তবে আমার পূর্ব্ব বাক্য হইতে তুমি আপনাকে ও পরমেশ্বরকে অবস্তু জানিয়া ভৌতিক তত্ত্বকে প্রত্যক্ষানুমান দ্বারা পরমতত্ব বোধ করিয়া অসত্য বিষয়ে আবদ্ধ থাকিতে। ইন্দ্রিয়জনিত ভাবনিচয়কে যে মন প্রত্যক্ষ করিয়া বোধ করে উহাকে আত্মানন্দ জ্ঞানে পর্য্যবসান কর তাহা হইলে অপ্রাকৃত গুণ সকলের কিছু কিছু অনুভব করিয়া ক্রমে ক্রমে বিমলানন্দের ধামকে প্রাপ্ত হইবে। আত্মানন্দের অনুভবই বিমলানন্দের দ্বার-স্বরূপ। এই পরম তত্ত্বের অনুভবকে সমাধি কহা যায়। ইন্দ্রিয় জনিত ক্ষুদ্র জ্ঞানাত্মক যে যুক্তি, তাহার ঐ বিষয়ে গতি না থাকায় তাহার দ্বারা এই পরমতত্বের অনুভব স্বরূপ আত্মপ্রত্যয়ের বিশেষ কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মপ্রত্যয় সম্ভূত যে সমাধি তাহাই কেবল আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বিষয়ে কার্য্যকারী হয়। অনুভবানন্দই যে চরম প্রাপ্য তাহা নহে, উহা কেবল চরম প্রাপ্য বিশুদ্ধ সত্ত্বধামের দ্বার স্বরূপ। জীবাত্মা সমাধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বধামের অভৌতিক দেশ ও তদাত্মক বস্তু সকল দেখিতে পান এবং আত্মাকে তথায় ক্রমে ক্রমে নীত করেন। হে শিষ্য অভৌতিক দেশ শব্দে ভাবের বিরোধ বোধ করিও না যেহেতু বাক্য সকল ইন্দ্রিয় সম্ভূত মনের প্রকাশক মাত্র। অতএব ঐ অপ্রাকৃত ধামের আমি যত কিছু বর্ণন করিব তাহা বাক্যের ব্যভিচার মলের দ্বারা দূষিত হইবে কিন্তু তুমি তাহার অপ্রাকৃত সারভাগকে উপলব্ধি করিবে আমার এইটী বিশেষ উপদেশ। দেশ শব্দে আকৃতি বিস্তৃতি বিশিষ্ট আধারকে ভৌতিকভাবে উপলব্ধি হয় কিন্তু আমি যখন অভৌতিক দেশ শব্দ ব্যবহার করিলাম। তখন তুমি আত্মার অনুভবরূপ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত জগতকে উপলব্ধি করিবে আমার বাক্য মলকে লইবে না। হে শিষ্য! তুমি যখন সমাধির দ্বারা অপ্রাকৃত ধামের অন্বেষণ করিবে তখন ভৌতিক ভাবকে পরিত্যাগ করিবামাত্র এক অপূর্ব্ব বিরজা নদী দেখিতে পাইবে। ঐ বিরজাতে স্নান করিয়া তুমি স্বয়ং অপ্রাকৃত কলেবর প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর পরব্যোম নামে এক অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠ ধাম দৃষ্টি করিবে। তথায় ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ পরমেশ্বরকে বিরাজ করিতে দেখিবে। জগদীশ্বরের বিমল দাস্য সুখই যে জীবের একমাত্র স্বভাব তাহা তথায় উত্তমরূপ উপলব্ধি করিবে। স্নিগ্ধতা, যশ, কৌশল, অজেয়তা, প্রফুল্লতা, আকর্ষণ শোভা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, নিয়ম প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণ নিচয়ের মূর্ত্তি স্বরূপ, শ্যামবর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, তুলসীগন্ধ, বনমালা, লক্ষ্মী, গরুড় ও বিশ্বক্সেন প্রভৃতি ভগবদ্ পারিষদ্ সমুদয় দেখিতে পাইবে। ইহাতে যদিও বহুতর আনন্দ প্রাপ্ত হইবে তথাপি ঐশ্বর্য্যজনিত আনন্দকে তুমি তৃপ্তিকর বোধ করিতে পারিবে না,

যেহেতু তদ্দ্বারা তুমি কেবল আশ্চর্য্য-সম্ভূত আনন্দ ব্যতীত ভগবানের স্বরূপ স্পর্শানন্দ পাইতে পারিবে না। তোমার আত্মা অধিকতর উন্নতির প্রার্থনা করিবে অতএব তুমি অতিশীঘ্রই তদূর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া গোলোক নামা অন্তঃপুরধামে প্রবেশ করিবে। গোলোক ধামের মহান্ সীমার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার একটী আশ্চর্য্য অবস্থা হইবে। তুমি তখন নিজ পুরুষত্ব পরিত্যাগ করত আপনাকে স্ত্রীলোক জ্ঞান করিবে। ইহাতে আরও আশ্চর্য এই যে, তুমি যে কখন পুরুষ ছিলে তাহা তোমার স্মরণ গোচরও হইবে না তখন তোমার বোধ হইবে যে তুমি জগতে পূর্ব্বে এক গৃহস্থিনী ছিলে।
বিধিমার্গানুশাসনরূপ কোন ব্যক্তির সহিত তোমার পূর্ব্বে পরিণয় হইয়া ছিল, তুমি বহুকার স্বীয় পতির সেবায় বিধিবৎ নিযুক্ত থাকিয়া পতিব্রতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলে কিন্তু কোন সময়ে যমুনা তটস্থ কদম্ব কানন মধ্য হইতে এক আশ্চর্য্য মধুর বংশীশব্দ তোমার কর্ণগোচর হইয়া তোমাকে অস্থির করায় জগদ্রূপ চিত্রপটে কোন সখী কর্ত্তৃক তোমার আকর্ষকের বংশীবদন মূর্ত্তি দেখিয়া তুমি আরও বিহ্বল হইলে। শাস্ত্ররূপ ভাট সকলও তোমার আকর্ষকের গান করিতেছিল তাহাতে তোমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহাকে তোমার পূর্ব্বরাগ কহা যায়। এই বৈরাগ্য-রূপ পূর্ব্বরাগ হইতে তোমার পূর্ব্ব গৃহস্থ ধর্ম্ম বিসর্জন ও আকর্ষকের অন্বেষণে যমুনাতটে বৃন্দাবনে তোমার অভিসারিকা বিভাবিত হইল। ঐ পূর্ব্বোক্ত গোলোক ধামের সীমা প্রাপ্ত হইবামাত্র তোমার এই সমুদয় ভাবের উদয় হইয়া তুমি উন্মত্তবৎ ঐ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের বন হইতে বনেতে ভ্রমণ করিবে তুমি তথায় একলা থাকিবে না। তোমার অবস্থাপ্রাপ্তা অনেক সহচরীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন তোমার মনে হইবে যে তুমি যে গ্রামের গোপবনিতা ছিলে সেই গ্রামের অন্য সহচরীগণ তোমার সঙ্গী হইয়াছে অতএব তাহারা চিরপরিচিতা ও তোমার মহৎ সুহৃদ্বর্গ। তুমি তথায় বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগরূপ দুই প্রকার পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে। ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত পরমেশ্বরের পরমমাধুর্য্য তোমার প্রেমের উদ্দীপক ও আলম্বন স্বরূপ হইবে। অবশেষে কৃষ্ণানুস্পর্শরূপ কেবলানুভবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই তোমার মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নতি হইবে। এই প্রকার উপদিষ্ট পুরুষেরা সমাধিযোগে ভগবদ্ধামকে প্রাপ্ত হন। মহৎ লোকেরা এই অপ্রাকৃত ধামের আবিষ্কার করায় ইহাকে মহৎকৃত ভগবদ্দাস বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। এই সমাধি স্বরূপ মহদুপায় অবলম্বন করিলে পুরুষেরা অনায়াসে এই দুস্তর ভবসমুদ্রকে পার হইতে পারে। ভবসমুদ্র পার হইবার উপায়ান্তয় নাই, অতএব সমস্ত বিবেকী জীবের এই নির্ম্মল উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বধাম স্বরূপ কেবল প্রেমই জীবের পক্ষে পঞ্চম পুরুষার্থ। যাঁহারা এই প্রেমের অধিকারী তাঁহারা ধম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থকে নিতান্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩১

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্র সৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমন্ত্রতে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

হে দ্যুমন অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ! আত্ম প্রত্যয়ানুভূত ভক্তিমার্গের আবিষ্কর্ত্তা মহোদয়গণ সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া প্রযুক্ত তোমার পাদপদ্মতরী স্পর্শ করিয়া স্বয়ং ভয়ানক ভবার্ণবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু ঐ অপূর্ব্বতরী এই জগতেই রাখিয়া গিয়াছেন, যেহেতু তুমি সমস্ত সাধুলোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাক।

স্বপ্রকাশ নাম সম্বোধনের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরকে আবিস্কার করার প্রযোজন হয় না, আত্মপ্রত্যয়রূপ দর্শনে তিনি অনায়াসে দৃষ্ট হন। যুক্তিগর্দ্দভব্যক্তিগণ সহসা ঐ স্বতঃপ্রত্যয়রূপ আত্মপ্রত্যয়কে স্বীকার করিতে চাহে না । ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের উপকারার্থ আত্ম প্রত্যয়বৃত্তিকে যে সমস্ত মহোদয় স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে উহার আবিষ্কর্ত্তা কহা যায়। ঐ সকল মহোদয় যে পরম দয়ালু ইহাতে আর সন্দেহ কি ? এই পরম রমণীয় ভক্তি মার্গ আবিষ্কার করত আবিষ্কর্ত্তা জগদীশ্বরের আশ্রয়রূপ তরণীযোগে ভয়ানক ভবসমুদ্র পার হইয়াছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁহারা ঐ তরণী এই পারেই অন্যান্য জীবগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার দ্বারা একটী বিশেষ তত্ত্বের প্রকাশ হইতেছে । আবিস্কৃত সত্য সমুদয় দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ সত্য ও সাম্বন্ধিক সত্য। আবিষ্কর্ত্তাগণ কোন একটা উপায় নির্ণয় করিয়া নিজ নিজ কার্য্যোদ্ধার করেন, এই উপায়টী তাঁহাদের পক্ষেই ফলদায়ক কিন্তু অন্যের পক্ষে তদ্রুপ হয় না। কোন কোন মহাত্মা জগৎ কৌশল দৃষ্টে যুক্তি পথাবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরের পদাশ্রয় করত শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ যুক্তি পথ অবলম্বন করিয়াও অনেকানেক ব্যক্তি নিরীশ্বর হইয়া উঠেন। অতএব যুক্তি পরমপদ প্রাপ্তির পক্ষে স্বরূপ সত্য নহে অর্থাৎ সাম্বন্ধিক সত্য মাত্র। ইহাতে তুলনাস্থলে বলিতে হইবে যে, যুক্তি মার্গরূপ তরী অবলম্বন করিয়া যে সমুদয় মহোদয় ভব সাগর পার হন তাঁহারা স্বার্থপর হইয়া তরণী খানি সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান। কিন্তু আত্ম প্রত্যয়রূপ স্বরূপ সত্য তদ্রূপ নহে। জীব যৎকালে ঐ আত্ম প্রত্যয় সম্ভূত ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন তখন তাঁহার ভগবৎ পাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্তি হইবে না। অতএব এই স্বরূপ সত্যের আবিষ্কর্ত্তা নিঃস্বার্থরূপে দয়ালু। এই সত্য যে চিরকাল জীবের একমাত্র অবলম্ব্য হইবে ইহাতে সন্দেহ কি?

এই ভবার্ণবকে সুদুস্তর ও ভয়ানক বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভব সংসার যে কতদূর ভয়ানক তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। অনেকানেক অদূরদর্শীগণ এই সংসারকে ঈশ্বরের প্রিয়ক্ষেত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন! তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে এই সংসারটী ঈশ্বরের উদ্যানস্বরূপ এবং জীবসকল ইহার রক্ষক ও পরিপালক রূপে নিযুক্ত আছেন।

বৈদিককর্ম্মকাণ্ডে যাহাদের চরমফল প্রাপ্তির আশা তাঁহারা বলেন যে জীবের বৈরাগ্য অকর্ম্মণ্য, যেহেতু ঈশ্বরের দাস্যরূপ সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ না করিলে কেবল ভক্তি দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। এই যুক্তিদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া প্রবৃত্তিমার্গের স্থাপনা করিয়া থাকেন। অনেকানেক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র তার্কিকগণ কহিয়া থাকেন যে, সমুদয় জীব যদ্যপি বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করে তবে জীবের বংশরক্ষারূপ বৃহৎকার্য্য কাহা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং অতি স্বল্পকালের মধ্যে সংসার রূপ ঈশ্বরের ক্ষেত্র উচ্ছেদ হইয়া যাইবে তাঁহাদের সংসার সাপেক্ষ যুক্তি এই যে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করায় ঈশ্বরের কোন একটি মহান্ উদ্দেশ্য আছে।

মানব অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশ সভ্য ও পণ্ডিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ শিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার করত এই জগতকে এক উৎকৃষ্ট প্রদেশ করিবেন। তৎকালে জগদীশ্বরের কোন একটী মহান্ উদ্দেশ্য সফল হইবে। বৈরাগ্যের দ্বারা যদি এই জগৎকে উচ্ছেদ করা যায় তবে ঈশ্বর কদাচ আমাদের প্রতি সন্তোষ হইতে পারিবেন না। এই সকল অগম্ভীর যুক্তির দ্বারা তাঁহারা স্থাপনা করিয়া থাকেন যে, জগদীশ্বর আমাদিগকে যত প্রকার বৃত্তি দিয়াছেন ও ঐ সকল বৃত্তির বিষয় প্রদান করিয়াছেন ঐ সমুদয়কে সদ্ব্যবহার করিয়া মানবের পক্ষে সংসারের উন্নতি করা উচিত। এই সমুদয় প্রবৃত্তিমার্গীয় পুরুষেরা ভক্তির আস্বাদনে ও নিত্যানিত্যের বিচারে কখনই প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা যদি গম্ভীর যুক্তি অবলম্বন করেন তবে এই মতকে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং সত্য সঙ্কল্প। এই ব্রহ্মাণ্ড রচনায় তাঁহার কোন গৌণ উদ্দেশ্য থাকা স্বীকার করিতে পারা যায় না। তাঁহার উদ্দেশ্য সকল অগৌণে বিনা উপায়ে সিদ্ধ হয় যেহেতু তিনি সিদ্ধ সঙ্কল্প। সামান্য মানবগণের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার জ্ঞান সংগ্রহ করা সম্ভবে না। সামান্য শিল্পকার যেরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া উদ্দেশ্য সফল করে তদ্রুপ ঈশ্বরকে চিন্তা করিলে তাঁহার স্বরূপের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়। এই পরিদৃশ্য জগদ্রচনায় যদি কোন উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে ঐ উদ্দেশ্য এতদিবস অপেক্ষা না করিয়া সঙ্কল্প মাত্র সিদ্ধ হইত। অতএব প্রবৃত্তি-মার্গ যে মানবের পক্ষে কেবল স্বার্থপর ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবার নাম স্বার্থ অতএব পণ্ডিতেরা নিস্বার্থ হইয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিই অবলম্বন করিবেন। বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি জীবের স্বভাব এবং সংসারই জীবের বন্ধ। এই ভব সংসারে ইন্দ্রিয় সুখ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। শিল্পবিদ্যার ফল স্বরূপ ধূম্রযান ও তড়িৎবার্ত্তাবহ প্রভৃতি যত কিছু হইতে পারে এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের আবিষ্কৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূতত্ব, পশুতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, তড়িত্তত্ত্ব, ধাতুতত্ত্ব, জ্যোতিষ-তত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় ও পাওয়া যাইতে পারে এ সমুদয়ই কেবল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় বর্দ্ধিত মনের সুখকর হইবে, আত্মার পক্ষে বিশেষ উপকার করিবে না।

এই সমুদয় অনিত্য পদার্থের জ্ঞান নিত্য পদার্থ জীবের কি বিশেষ উপকার করিতে পারে ? অনিত্য পদার্থে জড়িত হলে নিত্য বিচারের ব্যাঘাত হয় যেহেতু তদ্বিষয়ে সময় থাকে না। কিন্তু জগদীশ্বর করুণাময়, এজন্য তিনি জীবের প্রতি মহৎকৃপা করত সমুদয় অনর্থ হইতে ও অর্থ প্রাপ্ত হইবার উপায় করিয়া দেন । প্রাকৃত তত্ত্ববাদী পাষণ্ডতা প্রযুক্ত স্বীয় পরিশ্রমের ফল স্বরূপ প্রাকৃত তত্ত্বই অন্বেষণ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে অপ্রাকৃত তত্ত্ববাদীর গৌণ ফল হইয়া থাকে। শোভা, অর্থ সংগ্রহ ও রাজ্যপালন জন্য সৈন্য চালন। প্রভৃতি নিতান্ত সাংসারিক উদ্দেশ্যে যে ধূম্রযানের সৃষ্টি হইয়াছে তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত পণ্ডিতেরা সাধু দর্শন, উৎকৃষ্ট ভক্তি-উদ্দীপক স্থান দর্শন প্রভৃতি উত্তম উত্তম কর্ম্ম সকল প্রাপ্ত হয়েন। বস্তুত প্রাকৃত বিষয়ের উন্নতিতে এই সমুদয় উপকারই হইয়া থাকে।

শাস্ত্র, যুক্তি, ঐতিহ্য ও অনুমান এই সমুদয় প্রমাণের দ্বারা ভব সংসারকে নিকৃষ্ট কহা যায়। ইহাই জীবের কারাগার। জীবের স্বরূপ অপ্রাকৃত অতএব দেহ যোগটী কেবল বিড়ম্বনা বই আর কি বলা যাইতে পারে। অদূরদর্শীগণ এই মীমাংসার যদিও প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না তথাপি ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করাও তাঁহাদিগের পক্ষে কঠিন।অকল্যাণ শীঘ্র মানবকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। যত দিবস কর্ম্মজনিত বন্ধ ক্ষয় হইবার সময় উপস্থিত না হয় তত দিবস জীব সংসার গতির প্রতি প্রেম করিয়া থাকে, যেহেতু নিত্যবিষয়ে প্রেম জন্মিবামাত্রই অনন্ত কল্যাণ উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর-দত্ত স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারই এই দুরন্ত অমঙ্গলের একমাত্র কারণ। সংসার যদিও অমঙ্গল স্বরূপ তথাপি ইহার উদ্দেশ্য জীবের মঙ্গল সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাজাদিগের কারাগার সংস্থাপনের কি উদ্দেশ্য? প্রজার কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। দণ্ডবিধিও মঙ্গলজনক। জগদীশ্বরের শেষত্ত্ব অর্থাৎ নির্ম্মল দাসত্বই জীবের যথার্থ স্বভাব। ঐ স্বভাবকে উজ্জল করিবার জন্য স্বাধীনতারূপ একটি রত্ন জীবকে ঈশ্বর প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা ঐ স্বাধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় ভোগেচ্ছায় রত হইয়াছেন তাঁহারাই বদ্ধ ও তাঁহাদের অবস্থাকে সংসার কহা যায়। এই সংসারের উৎকৃষ্ট অংশই ইহা হইতে বিরাগ।

পরন্তু বৈরাগ্যও শুষ্ক হইলেও অনর্থপ্রদ। ভোগ পরিত্যাগই যে জীবের স্বভাব এমত নহে। জীবের স্বভাব এই যে স্বয়ং ঈশ্বরের ভোগ্য হইয়া তাঁহার দাসত্বামৃত পান করিতে করিতে পরমেশ্বরের পূর্ণানন্দের বিষয় হয়। অনেকে বৈরাগ্যের যথার্থ অর্থ না বুঝতে পারিয়া দেহের নানাবিধ দণ্ড দিয়া থাকেন। দেহকে অনিত্য বোধ করিয়া দেহের ক্রিয়াসকল দেহের জন্য এবং আত্মার কার্য্য সকল নিজকার্য্য এরূপ স্থির করিয়া অনুষ্ঠান তৎপর হইলে বৈরাগ্য হয়। দেহেতে বিরক্ত হইয়া যদি কেহ উহাকে ত্যাগ করতে বাঞ্ছা করেন তবে বৈরাগ্যের বিপরীত হইয়া উঠে। রাজাকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ কোনব্যক্তি উপযুক্ত কালের পূর্ব্বেই যদি পলায়ন পরায়ণ হয় তবে সে অধিক দণ্ডের যোগ্য হয় বলিতে হইবে।

অতএব বৈষ্ণব ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপন নিরূপিত কালকে অতিবাহিত করিতে যত্ন করিবেন। বিষয় সকলে আসক্তি না করিয়া দেহের জন্য নিয়মিত রূপে কর্ম্মাচরণ করত কৃষ্ণতত্ত্বরূপ ভগবৎ পাদপদ্মে চিত্ত ও আত্মাকে অর্পণ করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া অবশেষে স্বস্বভাবে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই এই বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিযোগই জীবের অভিধেয় তত্ত্ব ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩২

যেন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্তয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদন্ততঃ পতন্ত্যধোনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দ লোচন! অপর যে সকল ব্যক্তিরা তোমার দাসত্বরূপ স্বভাবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে বৃথা বিমুক্ত অভিমান করত বহু কষ্টে পরমপদ পাইয়াও তোমার পাদাশ্রয়কে অনাদর করে তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানদ্বারা ব্যক্তিরা যে পরমপদকে প্রাপ্ত হয় তাহা স্থির থাকে না। অপ্রাকৃত জীবের প্রাকৃত পদার্থের সহিত সম্বন্ধ রাহিত্যকে পরংপদ বলা যায়। উহাই জীবের স্বপদ কিন্তু স্বভাব নহে। ভগবদ্দাস্যই জীবের স্বভাব। অনেকানেক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ভক্তিকে হীন বোধ করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপন করেন। অখিল বেদে এই তিন প্রকার উপায় লক্ষিত হয়। কর্ম্মকাণ্ড বহুবিধ। সংসার স্থাপনের জন্য বর্ণ ও আশ্রম্‌ভেদে যতপ্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে ঐ সমুদয়ই কর্ম্ম। বর্ণভেদে সংস্কার ও আশ্রমভেদে অনুষ্ঠান এই সকল বিষয়ে যত প্রকার প্রাচীন ব্যবস্থা আছে তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র কহা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত কর্ম্মকাণ্ড অপার অতএব অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য, কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্যের চরমফল ত্যাগ, ইহাই বেদ প্রতিপাদ্য। কর্ম্মকাণ্ডে জীব বহুতর উন্নতি পাইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত হন। ঐ ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধাবসানে ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া যান। পুনরায় কল্পারম্ভে সংসারে প্রসূত হইয়া ঐ ব্রহ্মা যখন প্রকাশ হন, তখন ঐ সমুদয় কর্ম্মফল প্রাপ্ত জীব পুনরপি সংসারে বিচরণ করিতে থাকেন। অতএব কর্ম্ম যদিও কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া পরম পদ লাভ করান তথাপি তদ্দ্বারা জীবের নিত্য কল্যাণ সম্ভবে না বরং বার বার অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান যোগদ্বারা জগতের সমুদয় পদার্থ হইতে আপনাকে বিলক্ষণ জানিয়া বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মে আপনাদিগকে লয় করিয়া থাকেন, তাঁহারাও হিরণ্যগর্ভের সহিত প্রলয়াবসানে সংসারে পুনরাগত হন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ কৃচ্ছ্র-সাধনেও পরমপদ হইতে চ্যুত হইবার আশঙ্কা আছে। পরব্যোমের বহির্ভাগে যে একটী জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল আছে তাহাই ব্রহ্মলোক। জ্ঞানী লোকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ আত্মানন্দ ভোগকরত উহাতে তৃষ্ণারহিত হইবামাত্রই অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন।

অতএব কর্ম্মী ও জ্ঞানী ইহাঁরা যদিও আপনাদিগকে বিমুক্ত জ্ঞান করেন তথাপি ফলতঃ তাহা হইতে পারেন না। ইহাঁদের অভিমান পর্য্যন্তই সীমা। জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা চিরানন্দ না পাইবার বিশেষ কারণ এই যে যদিও জ্ঞান ও কর্ম বহুকষ্টে ও বহুকালে জীবের বৈরাগ্য রূপ স্বপদকে প্রাপ্ত করান তথাপি ঐ স্বপদাস্থত জীবকে তথায় দৃঢ় রাখিতে সক্ষম হন না, যেহেতু জীবের স্বপদে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সঙ্গী জ্ঞান ও কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়। বৈরাগ্য হইলে আর কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, যেহেতু ফল প্রাপ্তি হইলে উপায়ের প্রয়োজন কি ?

নদী পার হইয়া গেলে নৌকার আবশ্যক কি? কিন্তু স্বাভাবিক কার্য্য ব্যতীত অস্তিত্বের বৈক্লব্য ঘটিয়া উঠে। জীব অকর্ম্মকৃৎ হইয়া এক মুহুর্ত্তও অবস্থিতি করতে পারে না। স্বপদস্থ জীব সুতরাং অপদস্থ হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব সঙ্গী জ্ঞান ও কর্ম্মের সামীপ্য ও সৌহৃদ্য বাসনা করে। বাসনার নাম কাম ও কামের ফল কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফলের নাম দৈব। ঐ দৈববিপাকে জীব সুতরাং সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। শ্লোকে যে "অস্তভাবাৎ" শব্দ দেবতারা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে, সূর্য্যের প্রকাশই স্বভাব এবং অস্তই স্বভাবের বিপরীত। জীবকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়া উহার স্বভাব ভগবদ্দাসত্বকে প্রকাশের সহিত ও ভগবদ্বিমুখতাকে অস্তের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। যে সকল জীব ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতার কুব্যবহার করত ভগবদ্বিমুখতারূপ অস্তভাবকে স্বীকার করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিকে অবিশুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারাই কর্ম্ম ও জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বিমুক্ত অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ সকল ব্যক্তি অবশেষে ভগবৎ পাদাশ্রয়রূপ স্বীয় স্বভাবকে অবলম্বন করেন তবে পুনরায় সংসার গতি প্রাপ্ত হন না। অনেকানেক বিমুক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ চতুরতা-পূর্ব্বক ভক্তির সংস্থাপন করত তদুপরি জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, ভক্তি করিতে করিতে জ্ঞান হইয়া থাকে। এই বাক্যটী নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। ভক্তিই জীবের স্বভাব, নিত্যমুক্তজীব সকল ভক্তিব্যতীত আর কিছুই জানে না। নিত্যানিত্য জ্ঞানের দ্বারা জীবের বৈরাগ্য রূপ স্বপদ প্রাপ্তি হইলে ভগবদ্ পাদ সেবারূপ স্বভাবে জীব নিযুক্ত থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩৩

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্কচিদ্‌ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ
তৃয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমুর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব! হে প্রভো! তোমাতে বদ্ধসৌহৃদ তোমার দাসসকল সুপথ অর্থাৎ স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হন না বরং তোমা কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীনিকরের পালক সমুদয়ের মস্তকের উপর পদ প্রদান করত নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা যে বৈরাগ্য উদয় হয় তাহাও ক্ষণিক হইলেও শান্তরসের মধ্যে গণনা হইবে। অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা শান্তরস পর্য্যন্ত পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভক্তিমার্গ তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট। ভক্তিমার্গে চারিটী অপূর্ব্বরস আছে অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বস্তুত বৈষ্ণবধর্ম্মে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী রসের অবস্থিতি। শান্তরস জীবের স্বপদ, অপর চারিটী রস জীবের স্বভাব আত্মতত্ত্ব বিচারের দ্বারা আত্মাকে সমুদয় শারীরিক অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করণকে শান্তি কহে । শান্তরসে সমুদয় অনিত্য বিষয়ের তৃষ্ণা রহিত হয়। কিন্তু শান্তরসের অধিকারী পুরুষ যদ্যপি তাহাতেই আবদ্ধ থাকেন তবে শুষ্ক বৈরাগ্য হইয়া উঠে। স্বার্থ পরিত্যাগ অতিশয় মহৎ বটে কিন্তু পরমার্থের জন্য না হইলে ঐ উৎকৃষ্ট পদের যোগ্য হয় না। অর্থাভাবে, মূর্খতা প্রযুক্ত, সাধু লোকের তাড়নাক্রমে ও গৃহসুখের ব্যাঘাতবশত যে সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া কিছুই না করে, তাহাদের বৈরাগ্য নিতান্ত শুষ্ক ও নিস্ফল। অতএব শান্তরসই জীবের চরম ভাব নহে। যৎকালে জীব শান্তরসে অবস্থিতি করেন তখন তিনি স্বপদস্থ হইয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু স্বীয় স্বভাব তখনও তাঁহার গ্রহণ হয় নাই ইহা স্বীকার করতে হইবে। স্বপদস্থ জীব স্বীয় স্বভাব গ্রহণ করিবামাত্র দাস্যরূপ দ্বিতীয় রসের অবলম্বন করেন। যদিও বৈরাগ্যই বৈষ্ণবতার প্রথম সোপান বলা যায় তথাপি উহাতে কোন সাক্ষাৎ রস না থাকায় দাস্য প্রেমকেই মহাপুরুষগণ ভক্তিমার্গের প্রারম্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই দাস্য প্রেম বিশুদ্ধ হইলে সখ্যপ্রেম হয়। সখ্য-প্রেম গাঢ় হইলে বাৎসল্য হইয়া উঠে। ঐ বাৎসল্য-প্রেমের অকুণ্ঠত্ব নিবৃত্তি হইলে মধুর প্রেম। মধুর প্রেম পুনরায় অনন্তরূপিণী হইয়া অনন্ত উন্নতি প্রাপ্ত করান। এই সমুদয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা এস্থলে দুঃসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজন। এই শ্লোকে কেবল দাস্য প্রেমাবলম্বী মহাত্মা বৈষ্ণবগণের উল্লেখ। ঐ দাস্য প্রেমের অধিকারী পুরুষেরা জগদীশ্বরকে পরব্যোমে লক্ষ্মীপতিরূপে দৃষ্টি করেন ও দাস্য সম্বন্ধ সংস্থাপনার্থে প্রভু বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থাকেন। এনিমিত্ত দেবগণ এই শ্লোকে ভগবানকে মাধব ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাঁহারা কহিলেন হে কৃষ্ণ! তোমার সখা, পিতা, ও পুত্র এবং বনিতাগণ দূরে থাকুক, তোমার দাসগণও বিঘ্নজয় পূর্ব্বক স্বস্বভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়।

অর্থাৎ তোমার ঐশ্বর্য দৃষ্টে যাহারা প্রেম করিয়া থাকে তাহারাও ভ্রষ্ট হয় না। যাহারা উচ্চস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধ স্থাপনা করে তাহাদের তো কথাই নাই। অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের সেবক সকলও বিঘ্নবিজয় করিতে সমর্থ হয়। ব্রজভাবাপন্ন মহাত্মা গণের যে কোন বিঘ্ন হইতে পারে না, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। মাধব দাসেরাও সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে সমর্থ হন।

বিনায়ক অর্থাৎ বিঘ্ন অসংখ্য। তাহাদিগের পালনকর্ত্তা পাঁচটী। এই পাঁচটী বিরোধীকে ভগবদ্দাস্য প্রেমাবলম্বীগণও জয় করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হন। এই পাঁচটী বিরোধীর নাম **স্বরূপ-বিরোধী, পরত্ত্ব-বিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী, উপায়-বিরোধী, ও প্রাপ্তি-বিরোধী**। দেহাত্মাভিমান ও স্বস্বাতন্ত্র্য এই দুইটী **স্বরূপ-বিরোধী**। সংসারী জীব সকল দেহে আত্মবোধ করিয়া অনিত্য বিষয়ে প্রেম করে ও তজ্জনিত সুখদুঃখবশতঃ আত্মার নিত্যতা বিস্মৃত হয়। ঈশ্বর-পারতন্ত্র্যই যে জীবের কর্ত্তব্য, তাহা না বুঝিয়া ভোগেচ্ছায় ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতাকে স্বস্বাতন্ত্র্যত্বে বরণ করিয়া জীবের সংসার গতি হয়। **পরত্ত্ব-বিরোধীই** জীবের দ্বিতীয় বিরোধী। ভগবান ব্যতীত অন্য কোন জীব বা গুণ বা ভাণকে দেবতা বোধে প্রতিপত্তি করাকে পরত্ত্ব বিরোধী কহা যায়। ভগবদবতারে প্রাকৃত জ্ঞানকেও পরত্ত্ব বিরোধী কহা যায়। অনেকানেক পাষণ্ডলোক ভগবদবতারের গুণ, জন্ম, কর্ম্মসকল প্রাকৃত ইতিহাসের ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়া জগৎকে অপবিত্র করেন যেহেতু তাঁহারা পরত্ত্ব স্বরূপ অবগত নহেন। অর্চ্চাবতারে অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি সকলে স্থাবর বোধে অর্চ্চনাকেও পরত্ত্ব বিরোধী কহা যায়। যাঁহাদের প্রতিমাদর্শন মাত্রেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ধ্যান উপস্থিত হয় তাঁহারাই পরত্ত্ব স্বরূপ জানেন। পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা ও স্বতন্ত্র দাস্যে অনিচ্ছাকে **পুরুষার্থ-বিরোধী** কহা যায়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম এই পাঁচটী পুরুষার্থ। প্রেমই জীবের যথার্থ পুরুষার্থ। অপর চারিটী কৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারিটীর মধ্যে যেকোনটীর ইচ্ছাকে পুরুষার্থ বিরোধী বলা যায়। জড় ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীনতার পরিচালনার সহিত ভগবানের যে অপ্রাকৃত সেবা তাহাতে অনিচ্ছাকেও পুরুষার্থ বিরোধী কহা যায়। **উপায়-বিরোধী** দুই প্রকার অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত উপায়ান্তর বোধ ও পবিত্র অপ্রাকৃত ভাব পরিত্যাগ করত প্রাকৃত রূপে ভগবৎ সাধন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বোধ করিলে উপায় বিরোধী হয়। কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগ, দাসত্ব হইতে পারেনা, অতএব কর্ম্মকাণ্ডের সাধনের দ্বারা জীব ভগবান হইতে দূরীভূত হন। কিন্তু ভগবদ্দাসত্ব-জনিত যে ভজনক্রিয়া উহাকে কর্মকাণ্ড কহা যায় না। পবিত্র অপ্রাকৃতভাবেই ভগবৎ সাধন হইতে পারে। অনেকানেক অপণ্ডিত লোক প্রাকৃত দ্রব্য সকলকে ঈশ্বরোপাসনার উপকরণ মনে করেন কিন্তু স্বরূপবেত্তাগণ প্রেমকেই একমাত্র উপকরণ জানেন এবং তজ্জনিত ক্রিয়া-যোগে প্রাকৃত বস্তু ভগবান্‌কে উৎসর্গ করিয়া দেন।

স্নানাদিতে অন্তঃশুদ্ধি হইতে পারে না, অতএব বাহ্য-শৌচ দ্বারা যাঁহারা অন্তরের শুচি বোধ করেন তাঁহাদের উপায় স্বরূপ বোধ হয় নাই, বলিতে হইবে। **প্রাপ্তি-বিরোধী** বহুবিধ।

জন্মবশত শরীরের শ্রেষ্ঠত্ব ও নীচত্ত্ব বোধ, অনুতাপ শূন্য প্রায়শ্চিত্ত, বিচার না করিয়া গুরুস্থিরকরণ, ক্ষুদ্র দেবতাতে ভগ্‌বজ্‌ জ্ঞান, ভণ্ডকে বৈষ্ণবজ্ঞান, ভূক্তি ও মুক্তিতে অর্থজ্ঞান, ভ্রমাত্মক বিচারকে সত্যজ্ঞান, এই প্রকার অনেক প্রাপ্তি বিরোধী জ্ঞান হয়। জগতের অধিকাংশ লোকই জাত্যহঙ্কারে মত্ত হইয়া অপর অপরকে নীচ জ্ঞানকরত তাহাদিগকে বেদোক্ত ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকার প্রদান করে না এবং পক্ষান্তরে নীচকুল জন্মভাণ করিয়া অনেকানেক পুরুষ পরমব্রহ্মের বিমল জ্ঞানে আপনাদিগকে অধিকারী বোধ না করিয়া প্রাপ্তিবিরোধীর পূজা করিয়া থাকে। গোবধ করিয়া অনেকানেক ব্যক্তি কপর্দ্দক ও গাভি ইত্যাদি দান ও চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি আচরণ করিয়া নিস্পাপ ভাণ করিয়া প্রাপ্তি-বিরোধী উপাসনা করে। পরন্তু ভক্তিজনিত অনুতাপ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত সফল হইতে পারে না। অনেকেই কুল গুরুকে গুরুবোধ করত গুরু-সেবা করিয়াছি এমত বোধ করেন ইহাও প্রাপ্তি বিরোধী।

অপ্রাকৃততত্ত্ব ব্যাখ্যা কর্ত্তাই যথার্থ গুরু, যেহেতু কৃষ্ণতত্ত্ব যিনি অবগত নহেন তিনি যথার্থ জ্ঞান প্রদর্শক গুরু হইতে সক্ষম হন না। অপদার্থতে পদার্থ বোধ করিলে কোন উৎকৃষ্ট ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদ্র দেবতায় ভগবদ্ধুদ্ধি করা ও অনর্থপ্রদ পরমেশ্বর অদ্বিতীয় অতএব দেবতান্তর অসম্ভব। যেকোন দেবতার উপাসনা করা যায় তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হয় কিন্তু উপাসনা অনির্ম্মল হওয়া প্রযুক্ত সুখকর হয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাসনাই প্রয়োজন অতএব অন্যান্য গুণাধিষ্ঠিত ঈশ্বরের উপাসনায় সদগতি সম্ভবে না। ভণ্ডকে বৈষ্ণব জ্ঞানও বিরোধী স্বরূপ। কোন এক ব্যক্তিকে তুলসী মাল্যে ভূষিত ও গোপীচন্দনে চিত্রিত দেখিয়াই যদি বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে প্রকৃত বৈষ্ণবের অপমান হয়। সাধুসঙ্গের যে অপূর্ব্ব ফল তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শত শত তুলসী মালায় আবৃত ও সর্ব্বাঙ্গে নামাঙ্কিত পুরুষও হরিভক্তি বিহীন হইলে বৈষ্ণব আখ্যা পাইবার যোগ্য হয় না বরং বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সতর্কতা সহকারে পৃথক্‌ কৃত হয়। কালনেমী ও হনুমান সংবাদই ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে ভক্ত যদিও মালা ও তিলক প্রভৃতি বাহ্যিক লক্ষণ পরিত্যাগ করেন তথাপি তাঁহাকে বৈষ্ণবগণ সাধু বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। বাহ্য বৈষ্ণবতা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। বাহ্য বৈষ্ণবের সহবাসে সাধুসঙ্গ হয় না। ভুক্তি ও মুক্তিকে পুরুষার্থ জ্ঞানও প্রাপ্তি বিরোধী। কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ভুক্তিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলভোগকে ভুক্তি কহে। জ্ঞানকাণ্ডে যাহারা আবদ্ধ তাঁহারা মুক্তিকে পুরুষার্থ বলেন। মুক্তি কখনো পুরুষার্থ হইতে পারে না। সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চ প্রকার মুক্তি,

ইহার মধ্যে সাযুজ্য মুক্তি অগ্রাহ্য। অন্য চারিপ্রকার মুক্তি লভ্য করিয়াও যদি ভগবৎপ্রেম না পাওয়া যায় তবে জীবের কি হইল? মুক্তি জীবের স্বপদ কিন্তু স্বভাব নহে। যতক্ষণ জীব স্বীয় স্বভাবকে পুনঃ প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়াছে এমত বলা যাইতে পারে না। অতএব ভগবৎ প্রেমই পুরুষার্থ। তদিতর বস্তু ভুক্তি ও মুক্তিকে অর্থ বলিয়া বোধ করিলে মূর্খতা প্রকাশ হয়।

এই সমস্ত বিরোধীগণকে জয় করা কেবল বৈষ্ণবের কর্ম্ম। জ্ঞানী ও কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় ব্যক্তিগণ ইহাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হন। অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! যখন উদ্ধবের ন্যায় তোমার দাসেরাও এই সমস্ত বিঘ্ননিকরের মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিচরণ করেন তখন উদ্ধবের পূজ্য তোমার ব্রজবাসী সখাগণ ও তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টাধিকারীসকল যে ঐ সমস্ত বিঘ্নকে তৃণবৎ জানিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩৪

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃ সমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥

অনুভবানন্দ স্বরূপ অপ্রাকৃত কৃষ্ণবপুই যদি ভগবানের স্বীয় বপু হয় তবে পরব্যোমস্থিত লক্ষ্মীপতি নারায়ণ রূপের প্রয়োজনাভাব এরূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্য দেবতারা কহিলেন, হে ভগবন্, স্থিতিতে অর্থাৎ পালনকর্ত্তা নারায়ণে শরীরিদিগের বদ্ধ জীবদিগের শ্রেয় প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বপু তুমি গ্রহণ কর যেহেতু ঐ চতুর্ভুজ বপুর দ্বারা বেদক্রিয়া, যোগ তপস্যা ও সমাধিযোগে তাহারা তোমারই অর্চ্চন করিয়া থাকে।

বেদক্রিয়া দ্বারা মানবগণ গৃহস্থ হইয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, তোমার বেদরূপী গরুড়ই গৃহস্থ ধর্ম্ম স্বরূপ নারায়ণরূপী তোমাকে সেবা করিতেছে। ধর্ম্মকে গৃহস্থগণ বহন করে কিন্তু উহার মূল রসস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি শীঘ্র প্রাপ্ত হয় না। গৃহস্থ বৈদিক ধর্ম্মের সহিত গরুড়ের বহন ক্রিয়াতে তুলনা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মচারীগণও শরীরের যোগ সাধন করিয়া তোমার পরমাত্ম স্বরূপ বৈভবকে পূজা করিয়া থাকে, অতএব যোগদ্বারাও তোমার ঐশ্বর্য্য প্রেমই হইয়া থাকে। বানপ্রস্থ মুনিগণও মানসিক তপস্যা দ্বারা তোমার ঐশ্বর্য্যকে ধ্যান করে। কৃতজ্ঞতারূপ বৃত্তির দ্বারা তোমার প্রদত্ত প্রাকৃত দানের অনুশীলন করতঃ তোমাকে ধন্যবাদ দেয় ও ধ্যান করে। সন্ন্যাসীসকল জ্ঞানযোগে তোমার ব্রহ্মত্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যে আবিষ্টচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা তোমার বৃহত্তত্ত্বের উপাসনা করে। এই সকল বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণ বোধ হয় যে, চতুর্ব্বিধ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম সমুদায়ই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লোভেই ভগবদৈশ্বর্য্যের পুনঃ পুনঃ উপাসনা করে। যদিও উহাই জীবের পরমশ্রেয় নহে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম-রূপ পরমশ্রেয়ের উপায় স্বরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। নারায়ণদাসেরা ঐ চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্মের মধ্যে পঞ্চবিধ উপায় লক্ষ্য করিয়াছেন যথা কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান। যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যান, সন্ধ্যা ও বন্দনা এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্মের অঙ্গ। অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্র, বাস, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, পুণ্যনদীস্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, শাস্ত্রাভ্যাস, আরাধন, জপ, তর্পণ, উপবাস, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই সমুদয় কর্ম্মের প্রত্যঙ্গ। নারায়ণ মূর্ত্তি উপলব্ধি ও আলোচনাকে জ্ঞান কহা যায়। তৈলধারাবদনবচ্ছিন্ন অনুভব প্রীতিকে ভক্তিযোগ কহা যায়। ঐ ভক্তির পরিণামের নাম প্রপত্তি। এই প্রপত্তি দুই প্রকার অর্থাৎ আর্ত্তরূপ প্রপত্তি ও দৃপ্তরূপ প্রপত্তি। উত্তম আচার্য্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নির্হেতুক ভগবৎ প্রসাদে যে ভক্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে আর্ত্তরূপ প্রপত্তি কহে।

উত্তম আচার্য্যের উপদেশ ক্রমে সংসার যন্ত্রণা ভীত হইয়া বিপরীত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বারা যে ভক্তির উদয় হয় তাহাকে দৃপ্ত প্রপত্তি কহা যায়। প্রপত্তির দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয় যে ঈশ্বর প্রভু জীব দাস, ঈশ্বর নিয়ন্তা জীব নিয়াম্য, ঈশ্বর প্রাণ জীব দেহ, ঈশ্বর স্বামি জীব সত্তা, ঈশ্বর ব্যাপক জীব ব্যাপ্য, ঈশ্বর ধারক জীব ধার্য্য, ঈশ্বর রক্ষক জীব রক্ষ্য, ঈশ্বর ভোক্তা জীব ভোগ্য, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ জীব অজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান জীব অশক্ত, ঈশ্বর পূর্ণ জীব অপূর্ণ। ভবরোগ নিবৃত্তির উচিতোপায় প্রদর্শক মহাভাগবত কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করত তাঁহাকে প্রভু বোধ করাকে আচার্য্যাভিমান কহে। নারায়ণদাস কর্ত্তৃক এই সমস্ত উপায় অবলম্বিত হয়। ইহাতে অধিকার ভেদ আছে। জ্ঞানী কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভক্ত জ্ঞানী ও কর্ম্মী এতদুভয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আচার্য্যাভিমানী প্রপন্ন ঐ সমুদয় অপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু সকলেই নারায়ণের দাস। কেবল প্রেমরূপ যে কৃষ্ণদাসত্ব তাহা এ সমুদয় হইতে ভিন্ন, যেহেতু জীবের চরম অবস্থায় ঐ ভাবের প্রাপ্তি হয়। ঐশ্বর্য্যপ্রেম কদাচই বিমল হইতে পারে না, যেহেতু তটস্থ বিচারে ঐশ্বর্য্য প্রেমের নির্ম্মলতা দৃষ্ট হয় না। যে সকল ব্যক্তি প্রার্থনায় কৃতজ্ঞতা বৃত্তির ব্যবহার করে তাহারা বস্তুতঃ স্বার্থপর।

প্রার্থনায় যদি এরূপ কহা যায় যে ভগবন্! তুমি আমার প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছ, তুমি আমার শৈশব অবস্থায় আমার রক্ষার্থ জননীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়াছ, তুমি আমাদের কল্যাণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃত্তি সকল ও তাহাদের বিষয় সকল ব্যবস্থা করিয়াছ, তুমি এই জগতে অনেক প্রকার মঙ্গল বিধান করিয়াছ এবং আমার জন্য অনন্ত সুখ রাখিয়াছ। তুমি অনন্ত জ্ঞান সত্য স্বরূপ ও সর্ব্ব শক্তিমান। তাহা হইলে এরূপ বুঝা যায় যে, তুমি যদি এই সমস্ত না করিতে ও তুমি যদি এতদূর ঐশ্বর্য্যবান্ না হইতে তাহা হইলে তুমি আমার উপাস্য হইতে না। এইপ্রকার প্রার্থনা কতদূর দূষণীয়। কৃষ্ণদাসেরা যদিও এ সমুদয় বিষয় অবগত আছেন তথাপি ঐ সমুদয় বৃত্তি অর্থাৎ বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা, ভয় প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা কদাচ চালিত হন না। তাঁহারা কেবল পরমেশ্বরের মাধুর্য্যেই স্বভাবত প্রেমকে নিয়োগ করেন। ঐশ্বর্য্য ও কৃপা কৃষ্ণমূর্ত্তিতে থাকিলেও তন্মূর্ত্তির মাধুর্য্যালোকে গুপ্ত হইয়া আছে। যদিও কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই অর্ব্বুদ কোটি গোপবালক ও গাভিগণ সৃষ্টি হয় তথাপি ঐ শক্তি বংশীর নিকট কিছুমাত্র নহে।

যদিও কৃষ্ণ ইচ্ছা করিবামাত্র অবলীলাক্রমে বকাসুর রূপী ধূর্ত্ততা, পুতনারূপিণী তঞ্চকতা ও অঘাসুররূপী পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় তথাপি গোচারক বেশের উৎকৃষ্টতা ঐ শক্তি অপেক্ষা মহত্তর আকর্ষণীয়। যদিও অনুতাপকারী ঐশ্বর্য্যভক্ত ব্রহ্মা ও ঐশ্বর্য্য ভোক্তা ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠে স্বীয় স্বীয় রত্নময় মুকুটকে প্রতিঘাত করত অপূর্ব্ব শব্দের প্রকাশ করে, তথাপি গোপীদত্ত নূপুরের নিকট ঐ ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য কি? মাধুর্য্যানন্দের নিকট ঐশ্বর্য্যানন্দের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই।

অতএব দেবতাগণ কহিলেন হে ভগবন্! যদিও কৃষ্ণবপু সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তথাপি নারায়ণবপু ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যেহেতু ব্রহ্ম ক্লীব এবং নীরস নিম্বফলস্বরূপ। অরসিক কাকই কেবল উহার চোষণ কর্ত্তা যেহেতু উহাতে প্রেম নাই। শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা শান্তপদপ্রাপ্ত পুরুষেরা উহার সেবা করে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে নারায়ণরূপী তুমি তোমাতে দাস্যরূপ একটি আনন্দময় রস আছে। এই নারায়ণরূপ আম্র মুকুলই আকর্ষক, রসিক কোকিল ঐ মুকুলের আস্বাদন করিয়া দাস্যরস ভোগ করেন। যে ব্যক্তি কাকত্ব পরিত্যাগ করিয়া কোকিলত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় সে অনন্ত উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইয়া থাকে। সে কেবল মুকুলেই আবদ্ধ থাকে না; পরে ঐ মুকুল ফলরূপ হইলে উহার মধুর রসকেও আস্বাদন করিতে পায়। অতএব নারায়ণ দাসেরাও ধন্য যেহেতু তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়াছে।
শ্লোকে যে "শ্রয়তে" শব্দ আছে তাহাতে অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ বোধ করিতে পারেন ভগবানের বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপও নিত্য নহে। এই আশঙ্কা অকর্ম্মণ্য। ভগবানের অপ্রাকৃত কৃষ্ণমূর্ত্তি অনাদি ও অনন্ত যেহেতু ইহা সচ্চিদানন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে ভগবান যে কোন কালে গ্রহণ করেন ও কোনকালে পরিত্যাগ করেন এরূপ বিচার করা যাইতে পারে না, যেহেতু ভগবান আপনাকে আপনি ধ্বংস কিরূপে করিবেন; সচ্চিদানন্দকলেবর নিত্য এবং প্রকৃত সমুদয় অবস্থা হইতে বিলক্ষন। সমুদয় ঐশ্বর্য্যরহিত হইলেও ভগবানের অস্তিত্বরহিত হয় না। এ প্রযুক্ত প্রলয়াবসানে গোলোক বৃন্দাবনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় যেহেতু অপ্রাকৃত তত্ত্বের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পরব্যোমধাম ঐ অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ধামের পরিমাণ, অতএব উহার পর্য্যবসান গোলোক ধামেই সম্ভবে। অতি মহাপ্রলয় যদি কখন ভগবানের ইচ্ছা হয় তবে এই অসৎ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয় ও সৎস্বরূপ পরব্যোমধাম লুপ্ত হইয়া এক অপ্রাকৃত পরম তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকিবে। চতুঃশ্লোকীই ইহার প্রমান। মহাপ্রলয়েও পরব্যোমধামের পরিণাম সম্ভবে না। অতএব পরব্যোম ধামকে এই শ্লোকে স্থিতি শব্দে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং উহাতে যে নারায়ন মুর্ত্তি তাহাতেই শ্রয়তে শব্দের উদ্দ্যেশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা ও আগম তন্ত্রাদির বক্তা মহাদেব যে ভগবানের অপ্রাকৃত দেহকে অনিত্য কহিবেন ইহা কে স্বীকার করিবে?।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩৫

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্ বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনং।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥

অজ্ঞান নিবর্ত্তক বিজ্ঞানস্বরূপ তোমার নারায়ন মূর্ত্তি যদিও তোমার নিজ মূর্ত্তি নয় এরূপ বিতর্কিত হয়, তথাপি হে ধাত, হে গুণ সকলের নিয়ামক! তোমাতে পণ্ডিতেরা অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রকাশে ও তোমার বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত বপু অনুভূত হইতেছে, যেহেতু ঐ সত্ত্বগুণ নিজ আধার অথবা প্রকাশককে প্রকাশ করে।

জগতে যত ভাব আছে ঐ সকলের উৎকৃষ্টতাকে সত্বগুণ কহা যায় । শাসন কর্ত্তৃত্ব একটী মহান্ ভার তাহাতে ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য যশ শ্রী জ্ঞান এই প্রকার সমুদয় গুণ নিহিত আছে। ঐ সমুদয় গুণই কিছু না কিছু নরপতি গণের শাসন কার্য্যে দৃষ্ট হয়। যখন ঐ সকলকে পূর্ণভাবে চিন্তা করা যায় তখন সমস্ত রাজা গণের রাজা পরমেশ্বরের একটী ভাবের আবির্ভাব হয়। পার্থিব পদার্থ সমুদয়ই প্রাকৃত অতএব এই রাজ-রাজ্যেশ্বর ভাবকে প্রাকৃত ভাবে দেখিতে গেলেই এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ বিষ্ণুর ধ্যান হয়। বিষ্ণুই রাজ-রাজ্যেশ্বর যেহেতু তিনি ব্যতীত আর পালন কর্ত্তা কেহ নাই। এই প্রকার প্রাকৃত ভাবের সাধনও অজ্ঞান জনিত। অতএব জ্ঞান যোগের দ্বারা মানবগণ ঐ রাজ-রাজ্যেশ্বর বিষ্ণুর অপ্রাকৃত স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে পরব্যোমস্থ হইয়া নারায়ণ দর্শন করেন। এই মায়াময় ব্রহ্মাণ্ডে তিনটী লোক আছে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ ও শিবলোক। রজঃ সত্ত্ব ও তম এই গুণ ত্রয়ই ঐ তিনটী লোকের প্রকাশক। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অতএব প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তিন তিনটী লোকের অবস্থিতি। কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণকে সমষ্টি করিলে সাধারণ একটী পালনকর্ত্তার আবশ্যক। পরব্যোম ঐ পালনকর্ত্তার ধাম। তথায় নারায়ণ সমুদয় ঐশ্বর্যের স্বরূপ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। মূঢ় লোকেরা মায়াতীত হইলেই নারায়ণ দাস হইতে পারে। নারায়ণ দাস হইলেই জীবের অজ্ঞান দূরীভূত হইল। মায়ার গুণসকল অবিদ্যা-জনিত অতএব বিরজা স্নানের দ্বারা জীব জ্ঞানময় হন। এই অবস্থাটিকে বিজ্ঞান অবস্থা কহা যায়। নারায়ণ দাসত্বই জীবের অজ্ঞান নাশক বিজ্ঞান স্বরূপ অবস্থা বলিতে হইবে। এই অবস্থাই জীবের মুক্ত অবস্থা।

পূর্ব্বশ্লোকে এরূপ নির্ণীত হইয়াছে যে কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরম স্বরূপ অতএব নারায়ণ দাসেরাও ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণদাস হইবার যোগ্য হন। ইহাতে কোন তার্কিক এরূপ কহিতে পারে যে কৃষ্ণদাসত্ব যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ হয়, তবে জীবের নারায়ণ দাসত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন কি? সকলেই একেবারে কৃষ্ণদাস হইবার যোগ্য হউন। দেবগণ এই আশঙ্কা নিরসনার্থে বর্তমান শ্লোকের দ্বারা ভগবানকে স্তব করিয়াছেন। এই শ্লোকে দেবতারা ভগবানকে ধাতা সম্বোধন করত কহিলেন যে তুমি জগতের নিয়ামক। তোমার নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ক্রমশোন্নতিই তোমার অলঙ্ঘ্য বিধি।

জীব যখন স্বপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোগমন করিয়াছে তখন তাহাকে তোমার বিধির অনুগত হইয়া পুনরায় উঠিতে হইবে। বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক কার্য্য করিতে গেলে জীবের চেষ্টার সাফল্য হইবে না। এই জড়দেহে জীব আবদ্ধ থাকিয়া বিমল ধামের যোগ্য কিরূপে হইবে। প্রথমত, অনিত্য পদার্থের প্রতি স্নেহ দুর হইবে। দ্বিতীয়ত, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তাস্বরূপ পরমেশ্বর বলিয়া তোমাকে স্বীকার করিবে। তৃতীয়ত, তোমার সহিত যে সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিবে। চতুর্থত, তোমার প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা স্বভাবের দ্বারা তোমার প্রতি অনুষ্ঠান করিবে। এই মত ক্রমে ক্রমে যে জীবের অনন্ত কাল পর্য্যন্ত উন্নতি হইবে তাহা তোমারই বিধি। ভগবানের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই বিধি। পরমেশ্বর কোন বিধির বাধ্য নন যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ কিন্তু বৃক্ষাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেই ঐ বিধির বশবর্ত্তী। এই জন্য দেবতারা পরমেশ্বরকে ধাতা শব্দে সম্বোধন করিলেন।

পণ্ডিতেরা সাধ্যভক্তি ও সিদ্ধভক্তি লইয়া অনেক বিবাদ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে ভক্তির আবির্ভাব হয় তাহাই সাধ্য ভক্তি এবং সমুদয় মানবের পক্ষে সাধ্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ। সিদ্ধভক্তি অসম্ভব, যেহেতু পরমেশ্বরকে সিদ্ধ ভক্তির নিয়ামক কহিলে পক্ষপাতী কহা যায়। পক্ষান্তরে কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন যে জগদীশ্বর স্বতন্ত্র অতএব তিনি স্বীয় বিধির বাধ্য নহেন। এপ্রযুক্ত কোন কোন ব্যক্তিকে সিদ্ধ ভক্তি প্রদান করায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ত্ব হইতে পারে না। কোন কোন শ্রীসাম্প্রদায়িক পণ্ডিতেরা সহেতুক ও নির্হেতুক উপাধি প্রদানের দ্বারা ভক্তিকে বিভাগ করেন। নিগূঢ় বিচার করলে এই সমুদয় তর্কের পর্য্যবসান হয়। ভক্তিই জীবের স্বভাব ও জীবের সহিত সৃষ্ট হইয়াছে। জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করত যখন পতিত হয় তখন নিজ স্বভাব গুপ্ত হইয়া যায়। স্বস্বভাবের প্রতি অমনোযোগ ঘটিলেই জীবের অনিত্য বিষয়ে ঐ ভক্তি ন্যস্ত হইয়া যায়। জীব তখন অহংকার মদ্য ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রেম করিতে থাকে। কখনো সাধুসঙ্গবশতঃ যদি ঐ পতিত জীবের জ্ঞানোদয় হয় তখন জীব স্বস্বভাব পরিত্যাগ জন্য অনুতাপ করত স্বীয় প্রেমকে সমুদয় অনিত্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া নিত্য সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরে অর্পণ করেন। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, ভক্তি জীবের সহিত উৎপত্তি হইয়াছে। জ্ঞান ইহাকে উৎপত্তি করিতে সক্ষম নহে। তবে জ্ঞান ইহাকে জাগ্রত করে এই মাত্র। জ্ঞান ভক্তির দাস স্বরূপ; যখন জ্ঞান ভক্তির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে তখন জ্ঞানের যথার্থ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তি যদি পতিত না হইত তবে জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হইতে পারিত না। স্বীয় স্বাতন্ত্রের সদ্ব্যবহার জীব জ্ঞানের দ্বারাই করিয়া থাকেন অতএব জ্ঞান ভক্তির অনুরক্ষক ও সেবক। ভক্তি সর্ব্বকালেই সিদ্ধ কিন্তু যখন ভক্তি পতিত হইয়া জ্ঞানের সাহায্যে পুনরুত্থিত হয় তখন তাহাকে সাধ্যভক্তি কহি। ফলত সিদ্ধ ও সাধ্য ভক্তির প্রকার ভেদ নহে কেবল অবস্থা ভেদ মাত্র।

যে প্রকারেই বিচার করা যায় ঈশ্বরের নিয়মই বলবান হইয়া উঠে। তরণী যোগে নদী পার হইলে যেমত নিয়মাবলম্বন হয়, কোন উপায় দ্বারা আকাশ পথে নদী উল্লঙ্ঘন করিলেও ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। উপায় সাধনপূর্ব্বক ভক্তি অবলম্বন করাকে সাধ্য ভক্তি বলি অতএব ইহাও সত্য। এবং ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তি ইহাতে ইহাকে সিদ্ধও বলা যায়। অতএব বৈষ্ণবগণ যাহা কহিয়াছেন তাহা সমুদয়ই সত্য। বৈষ্ণব বাক্য মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই। এবং বৈষ্ণব বাক্য যতদূর বিরোধী বোধ হউক না কেন উহাতে তটস্থ বিচার করিলে বিবাদ নাই। তবে যে অন্যান্য লোকে বৈষ্ণবগণের বিবিধ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া মতের বিরোধ থাকা প্রকাশ করেন সে কেবল অজ্ঞানতার ফল মাত্র। বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনাদি ও অচ্যুত বিশ্বাস ও আত্ম প্রত্যয়ানুভব সম্ভূত। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণবদিগের কোন শাখা ভেদ বা মতভেদ স্বীকার করা যায় না। তবে ভাষাভেদ ও চিন্তার প্রণালীভেদ বশত কয়েকটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবেরা যখন শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই চারিটী প্রমাণের দ্বারা সমস্ত তত্ত্বের বিচার করিয়া কার্য্য করেন ও মত নির্ণয় করেন তখন তাঁহাদের মতে স্বরূপ সত্যের অবস্থান স্বীকার করিতে হইবে। সাম্বন্ধিক সত্যকে তাঁহারা স্থান দান করেন না। কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্র অথবা যুক্তির দ্বারা যাঁহারা আচরণ করেন তাঁহাদের সহিত বৈষ্ণবদিগের বিশেষ ভেদ আছে। যেহেতু কেবল শাস্ত্রবাদী অথবা কেবল মুক্তিবাদী খণ্ড জ্ঞানী কহা যায় তাহার বিচার সমস্ত খণ্ড-জ্ঞান দোষে সর্ব্বদাই দূষিত থাকে।

এই সমুদায় প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক জীব যখন বিচার করেন তখন, তাঁহার অনিত্য বিষয়ে প্রেম দূরীভূত হয়। প্রথমে সত্ত্বগুণের সেবা অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবকে সত্ত্ব গুণান্বিত করিয়া রজ ও তমগুণকে জয় করেন। এই কালেই বৈষ্ণবতার প্রবেশ বলিয়া স্বীকার করা যায়। সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক যখন ঐ সত্ত্বকে নিত্যানিত্য বিচারের দ্বারা নির্ম্মল করা যায় তখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণেও ঐশ্বর্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী প্রভৃতি বৃহত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। এই কালেই জীবের ঈশ্বর দাস্য হইল ইহাই বলিতে হইবে। যতকাল ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী প্রভৃতি গুণে ভূষিত ঈশ্বরকে দৃষ্টি করা যায় ততকাল নির্ম্মল সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের আস্বাদন সম্ভব হয় না। তখন ঈশ্বরের বৃহত্ত্বত্ত্ব ও স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব আলোচনা জীবকে সভয় করিয়া তোলে। জীব ভয়ে ভয়ে যৎকিঞ্চিৎ প্রেমের সহিত ঈশ্বরের দাস্য করিতে থাকেন। এই প্রকার সেবা করিতে করিতে জীবের উন্নতিকাল উপস্থিত হইলে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী বিহীন, এক পরম শান্তমূর্ত্তি দ্বারা পরমেশ্বর জীবের সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হন। ঐ পরম রমণীয় মূর্ত্তিই জগদীশ্বরের স্বস্বরূপ। তদ্দর্শনে জীব তন্মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। ভয় ও কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রভৃতি বৃত্তি সকল তিরোহিত হইল। পরম সখ্যের উদয় হইয়া জীব পরমেশ্বরকে স্বীয় সখা বলিয়া জানিতে পারেন। এই প্রকার সখ্যভাবে জীব কিয়দ্দিবস থাকিতে থাকিতে

উন্নতির যোগ্য হন। পরে সখ্যরসেও যে ভারী বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। বাৎসল্যরূপ পরম সখ্যরসের উদয় হয়। তখন জীব দেখেন যে পরমেশ্বর নিতান্ত আপনার। এই রসটিতে জীবের তৃপ্তি হইলে সার রসযুক্ত মধুর ভাবের উদয় হয়। তখন জীব জগদীশ্বরের নিরন্তর স্পর্শানন্দ ও অকুণ্ঠ প্রেম প্রাপ্ত হন। এই প্রেমে অনন্ত ভাব সকল থাকায় চরমত্ব সম্ভব হয় না। উন্নতি, উন্নতি মহোন্নতি এইপ্রকার ভাবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিতে হয়।

কৃষ্ণবপুই এই মহাভাব পর্য্যন্ত রাগানুগা ভক্তির আলম্বন। যেহেতু কৃষ্ণস্বরূপই জগদীশ্বরের স্বরূপ। ঐ স্বরূপে ঐশ্বর্য্যরূপ বৃক্ষের আশ্রয় হইলেই নারায়ণ স্বরূপ হইয়া থাকে। অধিকারী ভেদে নারায়ণও জীবের উপাস্য যেহেতু তিনি পরব্যোমস্থিত পরব্রহ্ম। ঐ নারায়ণ ধামের বহির্ভাগে অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ এক ব্রহ্ম-ধাম আছে। ব্রহ্মকে যাঁহারা উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা অরসিক যেহেতু পার্থিব ঐশ্বর্য্যের ভাবে মুগ্ধ হইয়া পরমজ্যোতির অন্বেষণ করতঃ ঐ জ্যোতিতে পার্থিব ভাবেরই সাধনা করেন। ফলতঃ তাঁহাদের ভগবৎ সাধন হয় না। সুতরাং সংসার পরিত্যাগরূপ স্বপদত্ব তাঁহাদের পক্ষে সুদুর্ল্লভ। তবে ভাগ্যবান পুরুষেরা ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া পরব্যোমধামে প্রবেশ করতঃ নারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। যদিও পরমেশ্বর একমাত্র দ্বিতীয় রহিত এ বিধায় তাঁহার ধামসকল এবং রূপসকলের ভেদ অযুক্ত বোধ হয় তথাপি বিচার করিলে এই ধাম ও রূপসকলের ভেদ দৃষ্ট হইবে। মানব যতই উন্নত হইতে থাকেন তাঁহার সহিত তাঁহার আত্মারাম ঈশ্বর ও কলেবর পরিবর্ত্তন করেন, ইহাই স্বরূপ সত্য। আত্মাই চিন্তামণি ধাম, ঐ ধামের রূপ পরিবর্ত্তনের সহিত ঐ ধামস্থ ঈশরের রূপ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে যখন অত্যুচ্চ ধামকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন কৃষ্ণবপুই দৃষ্ট হয়। মানব যতই জ্ঞানের চালনা করিতে থাকে ততই ঈশ্বর ভাবের নির্ম্মলতা হইয়া উঠে। অতএব সত্বগুণাধিষ্ঠিত বিষ্ণু হইতে মহাভাবের আলম্বন শ্রীকৃষ্ণের পরম অপ্রাকৃত রূপ পর্য্যন্ত চিন্তার নির্ম্মলতা হইতে পারে। যাঁহারা আত্ম প্রত্যয়রূপ অনুভবানন্দকে উপলব্ধি ও বিচার করিতে সক্ষম হন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। ইহাই জগদীশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। এই নিয়ম অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। যাঁহারা এই নিয়মের অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারা অধোগমন করিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। ইহার উদাহরণ অসংখ্য। প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভেদ বিচার করিতে সক্ষম না হইয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহারা লম্পট চরিত্র হইয়া নিতান্ত অপকৃষ্টপদ প্রাপ্ত হয়। সংসার হইতে বিরাগী না হইয়াই যদি কেহ পরব্রহ্মের সাধনে প্রবর্ত্ত হয় সে কেবল বর্ণাশ্রমের ব্যাঘাৎ করিয়া ভক্তি ব্রাহ্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মেরা নারায়ণদাস হইতে যদিও স্বভাবত হীন-পদস্থ তথাপি তাঁহারা স্বীয় অধিকারে পূজ্য হন।

দেবতারা এই সমস্ত বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব নারায়ণবপু যদিও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বপু নহে যেহেতু উহা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত তথাপি জগদীশ্বরের ক্রমশোন্নতি নিয়মাবলম্বন করার প্রয়োজনে নারায়ণবপুও জগতের পূজ্য যেহেতু উহাতেই অজ্ঞান নিবর্ত্তক বিজ্ঞান সাধ্য হয়। ঐ অপূর্ব্ব নারায়ণবপুও পরমেশ্বর কৃষ্ণকে প্রকাশ করে যেহেতু গুণ প্রকাশের দ্বারা জগদীশ্বর অনুভূত হন। নারায়ণ দর্শনে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে নারায়ণ স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণও শ্রীকৃষ্ণের গুণ বই আর কিছুই নহে অথবা শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণারূঢ় হইয়া নারায়ণরূপে বিলাস করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩৬

ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভির্নিরূপতিব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনো বচোভ্যামনুমেয়বর্ত্ম নো দেবক্রিয়ায়াং প্রতিমন্ত্যথাপি হি॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা নির্গুণ অর্থাৎ—অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন এরূপ পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাতে গুণময় নারায়ণ রূপকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা এই আশঙ্কা দূর করিবার আশয়ে দেবগণ কহিলেন হে দেব! হে নিয়ন্তা। গুণজন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা তোমার নাম ও রূপ নিরূপণ হয় না যেহেতু তুমি গুণজন্ম ও কর্ম্মের আধার যে প্রকাশ তাহার ও সাক্ষী। তুমি মন ও বচনের অনুমেয় মাত্র, প্রত্যক্ষ নহ। ক্রিয়া সমুদয়ে তুমি নিশ্চিতরূপে প্রতীত হও, অতএব গুণের দ্বারা তোমার উপাসনা হইলেও নির্গুণ স্বরূপ তুমি গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রকাশের দ্বারা পরমেশ্বর নারায়ণরূপ গ্রহণ করেন কিন্তু ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণও গুণ; অতএব গুণাধার পরম পুরুষ নহে! অতএব নারায়ণের দ্বারাও পরমেশ্বরের নাম ও রূপ নিরূপিত হয় না যেহেতু নারায়ণ রূপ গুণেরও সাক্ষী ভগবানকেই বলিতে হইবে। নারায়ণকে মনের দ্বারা ধ্যান ও কল্পনা করা যায় ও বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু বেদসকল ভগবানের অপ্রাকৃত ভাবের কল্পনা অথবা চিন্তা অথবা ব্যাখ্যা কবিতে না পারিয়া নারায়ণকেই প্রতিষ্ঠা ও গান করিয়াছেন। বস্তুত ভগবানের নাম ও রূপ নাই এইজন্য শুকদেব গোস্বামী তাঁহার কোন নাম না পাইয়া তাঁহাকে আকর্ষক অর্থাৎ কৃষ্ণ কহিলেন। তাঁহার কোন রূপ না পাইয়া চরাচরের রক্ষকরূপ গোপাল বেশে তাঁহাকে সজ্জীভূত করিলেন। কোন প্রকার অস্ত্রের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ স্বভাব ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া তাঁহার করে বংশী দৃষ্টি করিলেন। কোন প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া আনন্দ প্রকাশ ময়ূরপুচ্ছ ও শান্তি বাদক নূপুর তদীয় চরণে লক্ষ্য করিয়াছেন। কোন প্রকার বর্ণের দ্বারা তাঁহার রূপ ব্যাখ্যা করিতে অশক্ত হইয়া স্নিগ্ধতার প্রকাশক শ্যামবর্ণে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সমস্ত রূঢ়ী ভাবকে ব্যাখ্যা করিয়া ভগবানের স্বস্বরূপ দৃষ্টি করিয়াছেন। মন ও বাক্যের অনুমেয় যে পুরুষ তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য থাকিলেও ঐ সমুদয় ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশ হয় না বরং আচ্ছাদিত হইবারই সম্ভাবনা। তাঁহার স্বরূপের প্রতি যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রেম জন্মে তাঁহার তদীয় ঐশ্বর্য্যে কদাচ লুব্ধ বা আশ্চর্য্য হন না। বরং ঐশ্বর্য্য দৃষ্টি করিলে স্বরূপকে দূরে জ্ঞান করিয়া ঐশ্বর্য্যকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র স্বরূপ অন্বেষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিবার জন্য নারায়ণের রূপ ধারণ করিলে গোপীগণ বিস্ময় হইয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিল না; যাহাদের স্বরূপ মাধুর্য্যে প্রেম হয় তাহারা গুণজন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত যে ভগবদ্রূপ তাহাতেও আদর করেন না।

কৃষ্ণতত্ত্বই ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব, যেহেতু মন ও বচনের প্রকাশিত নহে, অনুমেয় মাত্র। এই কৃষ্ণতত্ত্ব গুণজন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা লক্ষিত হন না। গুণজন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণের রূপ ও নামও নিরূপিত হয় না। দেবকীর গর্ভে চতুর্ভুজ নারায়ণের জন্ম হয় অতএব জন্মের দ্বারা কেবল নারায়ণেরই বাসুদেব নাম হয়, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশকেই নারায়ণ বলা যায়, এ প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ, যেহেতু স্বরূপ হইতে অনুরূপ ক্ষুদ্র। নারায়ণও কৃষ্ণের অংশ হওয়ায় তাঁহাকে বস্তুত কৃষ্ণস্থ হইতে হয় এই জন্য কৃষ্ণকে বাসুদেব নাম দেওয়া যায়, নতুবা নহে! চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অতি শীঘ্রই প্রাকৃত শিশুর ন্যায় প্রকাশ পায় যেহেতু চতুর্ভুজেরও পরিণাম স্বরূপে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়। কৃষ্ণস্থ নারায়ণই জগতে বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ ঐ সমুদায় কার্যের দ্বারা উপাধি প্রাপ্ত হন না। অসুর-বধ প্রভৃতি কার্য্য সকলের দ্বারা কৃষ্ণের যত নাম করণ হইয়াছে ঐ সমুদয় নাম নারায়ণের প্রাপ্য। অতএব গুণজন্ম-কর্ম্ম সমুদয় নারায়ণের, কৃষ্ণের নহে। জন্মকালে ও অন্তর্ধান কালে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই প্রকাশ পায় যেহেতু আবির্ভাব ও তিরোভাব নারায়ণের সম্ভবে, নির্গুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সম্ভব হয় না। যেহেতু কৃষ্ণ, মন, বচন, গুণ, জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি যত প্রকার প্রকাশ ভাব আছে তাহার অতীত।

এই কৃষ্ণতত্ত্বকে অদূরদর্শীগণ দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে গোলোক পুরী হইতে সনক সনাতন প্রভৃতির অভিশাপ ক্রমে কৃষ্ণ জগতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সমাধান করিয়া পুনরায় স্বস্বরূপে অবস্থিত হন। এই প্রকার বক্তারা ব্যাসদেবের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সুন্দররূপ উপলব্ধি না করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বকে সাধারণে প্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরমেশ্বরের স্থান নিরূপণ ও তাঁহার শাপভয় প্রভৃতি প্রাকৃত বাক্যমাত্র। ইহাতে যে বাক্যমল আছে তাহা পরিষ্কার করত যে পুরুষ অনুভবানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ দর্শন করেন তাঁহার অমৃতত্ত্ব সম্ভব, নতুবা প্রাকৃতজ্ঞানে এই সমুদায় ব্যাখ্যা দৃষ্টি করিলে অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। “সত্যং পরং ধীমহি” এই প্রকার বক্তা যে ব্যাসদেব, তাঁহার লিখিত সাত্ত্বিক পুরাণ সমুদয়ে যে সমস্ত কথা আছে তাহা অপ্রাকৃত ভাবে পরিপূর্ণ অতএব ঐ সমস্ত হইতে যিনি প্রাকৃত ভাবকে অর্জ্জন করেন তাহার মঙ্গল কোথায়।

দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থা এই যে, কৃষ্ণলীলা কল্পিত বিবরণ মাত্র। জীবগণের আধ্যাত্মিক তাপোন্মূলন ইচ্ছায় বাদরায়ণ ঋষি আধ্যাত্মিক তত্ব সুলভ করিবার জন্য এই কৃষ্ণলীলা কল্পনা করত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা নহে। এই প্রকার ব্যাখ্যাও অযুক্ত। কল্পনাশক্তিও প্রাকৃত যেহেতু ইন্দ্রিয় ভাবজনিত মনই কল্পনা করে। আত্মপ্রত্যয়রূপ অচ্যুতবিশ্বাস যাহাকে অনুভবশক্তি কহা যায় তাহার সহিত মনের কোন সম্বন্ধ নাই। মন প্রাকৃত, কিন্তু অনুভব শক্তি অপ্রাকৃত। মনের দ্বারা যাহা কিছু কল্পিত হয় সকলই প্রাকৃত। অতএব কৃষ্ণলীলা যদি কল্পিত হইত তবে কি প্রকার

অপ্রাকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারিত। কল্পনা দ্বারা স্বর্গ-নরক ও অনেকপ্রকার লোকের চিত্রপট মানবগণের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল যাহার সহিত কখন সাক্ষাৎ করে নাই তাহার কল্পনা কিরূপে হইতে পারে? ব্যাসদেব যদ্যপি প্রাকৃতবস্তু হইতে অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কল্পনা করিতেন তবে কৃষ্ণতত্ত্বও কল্পনাও প্রাকৃত হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন না। চতুঃশ্লোকী প্রাপ্তির বিবরণেই ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্রহ্মা যখন সমুদয় প্রাকৃত বস্তুতে কৃষ্ণদর্শন পাইলেন না, তখন তিনি স্বীয় আত্মায় ভগবদ্ভাবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। ভগবানের নিকট হইতে যে অপ্রাকৃতজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন তাহাই ব্যাসের নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাসদেব ঐ জ্ঞানের দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মপ্রত্যয় অনুভূত যে জ্ঞান তাহা কদাচ প্রাকৃত কল্পনাবাচ্য হইতে পারে না এবং তল্লক্ষিত কৃষ্ণতত্ত্বও প্রাকৃত হইতে পারে না। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ সত্য ইহাতে কিছুমাত্র কল্পনা নাই, তবে যাঁহারা কৃষ্ণ লীলাকে কল্পিত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা প্রাকৃত ভাব হইতে স্বীয় জ্ঞানকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

দেবতারা এই জন্য কহিলেন যে, যে ব্যক্তিরা পরমেশ্বরের গুণ, জন্ম, কর্ম্ম, প্রাকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বোধ করিয়া তদ্বারা তাঁহার নাম ও রূপের ব্যবস্থা করে তাহারা মূঢ় এবং যাঁহারা কৃষ্ণ বিবরণ কল্পিত বোধ করিয়া তদ্দ্বারা উপাসনার প্রণালী পাওয়া গিয়াছে এইরূপ বোধকরে তাহারাও তদ্রূপ। যেহেতু অপ্রাকৃত ভগবান প্রাকৃত গুণ, জন্ম, কর্ম্ম, মন ও বচনের সাক্ষীমাত্র, তদ্গত নহেন। তাহারা তাঁহার যে কিছু নাম ও রূপ প্রদান করিবে তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত হইয়া উঠিবে। তাঁহার স্বরূপ, নাম, রূপ কহিতে পারিবে না। কেবল সম্বন্ধীয় নাম ও রূপ প্রকাশ করিবে এই মাত্র। কিন্তু তাহাতে জীবের পরম তৃপ্তি নাই। জীব যখন এই প্রকার তৃপ্তি রহিত হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় ব্যাকুল হন তখন ক্রিয়াতে ভগবানের প্রত্যক্ষতা দৃষ্টি করেন।

শ্রীধর স্বামী ক্রিয়া শব্দের অর্থ উপাসনা কহিয়াছেন। উপাসনা শব্দেও সম্পূর্ণ বোধগম্য নহে এইজন্য ক্রিয়া শব্দের অর্থ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। প্রাকৃত বিভাগে মানবের মধ্যে তিনটী বস্তু আছে অর্থাৎ দেহ, মন ও বাক্য। দেহে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহারা প্রাকৃত বিষয় উপলব্ধি করে। এ জন্য জগদীশ্বরকে অতীন্দ্রিয় উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। মনও ইন্দ্রিয়জনিত ভাব সকলের চালনা করিয়া থাকে অতএব উহারও ক্রিয়া সকল প্রাকৃত। বাক্য মনকে প্রকাশ করে অতএব উহাও প্রাকৃত। দেহ, মন ও বাক্য ভগবানের কিছুই জানে না। দেহ, মন ও বাক্য এই তিনটী বস্তুর বিলক্ষণ যে তত্ত্ব তাহাই জীব ও তাহাকেই আত্মা কহে। ঐ আত্মার দুইটী লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ। এই জ্ঞান ও আনন্দই পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করে যেহেতু অপ্রাকৃত পদার্থই অপ্রাকৃত পদার্থকে জানিতে পারে। এই অপ্রাকৃতজীবের অপ্রাকৃত ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি তাহাই ইহার ক্রিয়া।

ঐ ক্রিয়াকে উপাসনা কহা যায় এবং তদযোগেই জীব ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। জীব যেকাল পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতদেহে আবদ্ধ আছেন তত দিবস উপাসনা ক্রিয়া ও দেহে ব্যক্ত হইতে থাকিবে। আত্মা ভক্তিযোগে যখন উপাসনা করেন তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহবাসে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়। মন ভগবদ্ভাবের ধ্যান করিতে থাকে। দেহ হাস্য, পুলক, অশ্রু, নৃত্য, স্তম্ভ, স্বেদ এইসকল প্রকাশ করিতে থাকে। ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবানকে দৃষ্টি করিতে থাকে। হস্ত যাহা কিছু আহরণ করিতে পারে তন্মধ্যে প্রিয় বস্তুসকল জগদীশ্বরকে দান করিয়া তৃপ্ত হয়। পদ নৃত্য করত ও সাধু প্রতিষ্ঠিত স্থান সকলে বিচরণ করত তৃপ্ত হয়। চক্ষু ভগবদ্ভাব স্মারক প্রতিমা সকল দেখিয়া তৃপ্ত হয়। এই সমুদয় বাহ্যিক ক্রিয়াকে উপাসনা কহা যায় না, কিন্তু আত্মাতে যে সকল ভাবের উদয় হয় ঐ সকল ভাব দেহযোগে স্বভাবত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মা ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের প্রতি ধাবমান হইলে দেহ মথুরার নিকটবর্ত্তী হয়। আত্মা ভগবদ্রূপ দর্শনার্থে যতই ব্যাকুল হয় তত শীঘ্রই অর্চ্চাবতারের দর্শনার্থে চক্ষু ধাবমান হয়। আত্মা স্বীয় প্রিয়বস্তু প্রেম জগদীশ্বরকে দান করিতে ব্যাকুল হইলেই হস্ত পুষ্প চন্দনাদি ও ভোগ নৈবেদ্যাদি ভগবানকে দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এই সমস্ত কার্য্য অপ্রাকৃত উপাসনা-ক্রিয়ার প্রকাশিকা মাত্র, মুখ্য ক্রিয়া নহে। এই প্রকার অপ্রাকৃত উপাসনা ক্রিয়ায় জীবও ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন।

এই শ্লোকে কৃষ্ণলীলা যে অপ্রাকৃত ভাবে প্রত্যক্ষ, ইহাই কথিত হইল। এই লীলা যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অথবা কল্পনাযোগে মনের প্রত্যক্ষ এরূপ যাহারা স্থির করেন তাঁহারা কৃষ্ণলীলার অর্থ অবগত নহেন । কৃষ্ণলীলা অনাদি অনন্ত ও স্বতঃপ্রত্যক্ষ। ইহাই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী, অতএব কোন বস্তু ইহাকে চিত্রিত করিতে সক্ষম নহে। ইহা অপ্রতিম। আত্মপ্রত্যয়রূপ অপ্রাকৃত বিভাগে ইহার সদ্য অবস্থিতি! ইহাকে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা মনকল্পিত বিষয় বোধ করিলে অত্যন্ত অধমতা প্রকাশ হয়। অতএব জীবের অবস্থাসকল সমাপ্তি হইলে অবস্থা রহিত এই অপ্রাকৃত বিলাস প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। যতকাল জীব নানাবিধ অবস্থায় বিচরণ করেন ততদিবস সম্বন্ধীয় সত্য স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্থ বিষ্ণু অথবা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অথবা কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ অথবা পরব্যোম স্থিত মাধবকে দৃষ্টি করিয়া উপাসনা করেন। অবস্থার সমাপ্তি হইলে কৃষ্ণতত্ব প্রাপ্ত হন। জড়দেহে জড়ীভূততা হইতে স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত যত প্রকার ভাবের উদয় হয় ঐ সকলকে অবস্থা কহা যায়। স্বরূপদেহ প্রাপ্তির নাম অবস্থা।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩৭

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে॥১২॥

গুণজন্ম কর্ম্মের দ্বারা যেসকল নাম ও রূপ নিরূপিত হয় তাহা নারায়ণ উদ্দেশেই হইয়া থাকে, কৃষ্ণ উদ্দেশে হয় না এরূপ পূর্ব্বশ্লোকে ব্যক্ত হওয়ায় ঐ সমস্ত নাম ও রূপকে অনেকেই অগ্রাহ্য করিতে পারে এইজন্য দেবগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার পরম মঙ্গল নাম ও রূপ সকল যাঁহারা শ্রবণ, উচ্চারণ ও চিন্তন করিতে করিতে ও অন্যকে স্মরণ করাইতে করাইতে তোমার চরণারবিন্দে উপাসনা যোগে আবিষ্টচিত্ত হন, তাঁহাদের সংসারের সংকল্প থাকে না।

উপাসনা যদিও আত্মারই ক্রিয়া বলিয়া নিশ্চিত আছে, তথাপি জীব যত দিবস দেহের মধ্যে আবদ্ধ আছেন তত দিবস দেহ ও মন ও উপাসনার সহকারী হয়। দেহে শ্রবণ কীর্ত্তন ও মনে চিন্তন ও নিদিধ্যাসন এই দুই প্রকার উপাসনাও প্রসিদ্ধ। যদিও দেহ যোগ জীবের পক্ষে বাস্তবিক কারাবাস তথাপি এই অবস্থাকে সাধক সুব্যবহার করিবেন। ইন্দ্রিয় সকল যদিও বিষয় উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হইয়াছে তথাপি জীব নিজস্বভাব পরিচালনায় তদ্দ্বারা ভগবৎ সাধন করিয়া লইবেন। শ্রবণ কীর্তনই দেহীদিগের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি, যেহেতু শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা দেহের চরিতার্থতা সাধন হয়। কোটি চান্দ্রায়ণও জীবকে ততদূর শুদ্ধ ও নিস্পাপ করিতে পারে না যে প্রকার হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা হইয়া থাকে। পূজা ও নৈবেদ্যাদি জীবের ততদূর প্রয়োজনীয় বোধ হয় না যতদূর হরিকীর্ত্তন আবশ্যক। বহুবিধ উপাচারের সহিত কোন বিপ্র পরমেশ্বরের সাধনা করিলেও ঈশ্বরের ততদূর প্রসাদ সম্ভব হয় না, যতদূর ভক্তি সহকারে কোন চণ্ডাল হরিকীর্ত্তন করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যত প্রকার সাধন প্রণালী জগতে দৃষ্ট হয় সমুদয় অপেক্ষা হরিকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রবণ কীর্তনের মাহাত্ম্যের অবধি নাই।

দেহ যোগে শ্রবণ, কীর্ত্তন, মনের দ্বারা ধ্যান ও আত্মায় ভক্তিরসের চালনা ইহাই জীবের বিশেষ কর্ত্তব্য। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান নারায়ণেরই হইয়া থাকে যেহেতু নাম ও রূপ সমুদায় নারায়ণের, শ্রীকৃষ্ণের নহে। অনুভব প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের সাধন। অতএব দেহী যৎকালে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে থাকেন তখন তাঁহার আত্মা যদি ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আবিষ্ট হয় তবে ঐ দেহীর অধোগতি কখনই সম্ভব হয় না অর্থাৎ ক্রমশ ঊর্দ্ধগতি হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ চরণ কল্পবৃক্ষ পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ভক্তিলতা শ্রবণ কীর্ত্তন জলসেচনের দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ক্রমে বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণের পদে কল্পতরু প্রাপ্ত হয়। তথায় প্রেম ফুল ফলিতে থাকে। যত দিবস জীব দেহী থাকেন তত দিবস শ্রবণ কীর্ত্তন জল সেচনের দ্বারা ঐ লতাকে পুষ্ট করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩৮

দিষ্ট্যা হরেহস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোপনীত স্তব জন্মনোশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ
র্দ্রক্ষ্যাম গান্দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্॥১৩॥

হে হরে! পরমভাগ্য যে এই ধরণী তোমার চরণভূতা তোমার জন্মমাত্রে ইহার ভার অপনীত হইল। আমাদের পরমভাগ্য অদ্য তোমার সুশোভন চরণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশাদি শুভ লক্ষণ দ্বারা অবনীকে অঙ্কিতা এবং সুরলোককে তোমা কর্ত্তৃক অনুকম্পিত দেখিতে পাইব। প্রথমে ধরণী, চরণ ও জন্ম এই তিনটী প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে কোন প্রকার সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত নাই কেবল স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। তবে যে প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় সে কেবল বাক্যের মলদোষ মাত্র। শ্লোকের ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট ও নিগূঢ়। ভগবানের জন্ম নাই। জীবের অপ্রাকৃত বিভাগে ভগবানের আবির্ভাব মাত্র স্বীকার করা যায়। ধরণীশব্দে এস্থলে পৃথিবীস্থ জীব সমুদয়কে বুঝায়। নিত্যতত্ত্বের আবিষ্কারই কৃষ্ণজন্ম। কৃষ্ণ যখন জীবের আত্মায় পাদ শব্দে আশ্রয় প্রদান করেন তখন আত্মার ভার অপনীত হয়। ইহাই ভগবানের ঈশিতা। আত্মার ভার কি? জীব যৎকালে ঈশ্বরের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাতন্ত্রের অসদ্ব্যবহার করত ভোগেচ্ছাকে গ্রহণ করে, তখনই মায়া তাহার গলগ্রহ হইয়া ভার স্বরূপ হইয়া উঠে। মায়া গুণই জীবের যথার্থ ভার। ঐ ভারের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীব ক্রমে ক্রমে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তখন ঔষধের অন্বেষণ করিতে করিতে আত্মতত্ত্বরূপ ঔষধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাতেও ভার উত্তমরূপ যায় না। যতক্ষণ কৃষ্ণতত্ত্বরূপ মহৌষধি না প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হইতে পারে না। আত্ম প্রত্যয়রূপ চক্ষের দ্বারা যখন কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হয় তখন ভগবানের কৃপায় ঐ দুঃসহ ভার একেবারে বিগত হইয়া যায়। জীবের আত্মায় কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ দৃষ্টি করিয়া সমুদয় দেবগণ জীবকে ধন্য কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদ স্পর্শ দ্বারা জীবের আর কোন প্রকার দুঃখ রহিল না। যখন ভগবদ্বিষয়ে স্বরূপ সত্য প্রকাশিত হইল তখন জীবের আর দুঃখ কি? জীব যথার্থই চরিতার্থ হইলেন। ভগবানের পাদপদ্ম জীবের আত্মায় প্রদত্ত হওয়ায় ধ্বজ বজ্র ও অঙ্কুশ এই তিনটা আশ্চর্য্য অঙ্ক দৃষ্ট হইল। স্বরূপ সত্য সমুদায় সম্বন্ধীয় সত্যকে জয় করে অতএব ভগবানের আশ্রয়ে সমস্ত জয় হয়। ধ্বজ জয়ের চিহ্ন। কাঠিন্য প্রকাশ করিবার জন্য বজ্রের চিহ্ন প্রদত্ত হয়। ভগবানের স্বরূপ সত্যের আশ্রয় করিলে তাহা হইতে অন্যত্র যাইতে হয় না অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব অটল কৃষ্ণ পাদাশ্রিত ব্যক্তির সত্য হইতে পাদ স্খলিত হইবার আশঙ্কা নাই। কৃষ্ণতত্ত্বাশ্রিত ব্যক্তি স্বরূপ বিধিরূপ অঙ্কুশ প্রাপ্ত হয়েন অতএব বিপথ গতি তাহার পক্ষে অসম্ভব।

কৃষ্ণতত্ব প্রাপ্ত জীব ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ অঙ্কিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হন। অতএব জগতের মধ্যে তিনিই ধন্য। জীব কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে সুরলোকও ভগবানের দ্বারা অনুকম্পিত হন। ইহার তাৎপর্য এই যে সুরলোকস্থিত দেবতারাও জীব, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের বলে তাঁহারা ভোগাধিকার প্রাপ্ত হইয়া দেবতা পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন ভোগই অক্ষয় নহে। ঐ সকল দেবতা ভোগাবসানে নর গতি প্রাপ্ত হন। যৎকালে তাঁহারা সুরলোকে দেবত্ত্ব ভোগ করিতেছেন সেই সময়ে পৃথিবীতে যে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের ভোগক্ষয় হইবা মাত্র তাঁহারা পাইতে পারিবেন। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে ভোগরূপ যে বিড়ম্বনা তাহা দূরীভূত হয়, অতএব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশের দ্বারা দেবতারাও আপনাদিগকে অনুকম্পিত বোধ করিলেন।

কৃষ্ণতত্ত্বই জগতে পরমতত্ত্ব। ইহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত গুণের গন্ধও নাই। পণ্ডিত এই পরমতত্ত্বের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। যত দিবস এই কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ হয় নাই, ততদিবস পণ্ডিতেরা কল্পনা অথবা যুক্তির দ্বারা প্রাকৃত গুণের বিশুদ্ধ ভাবকে অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষুদ্রোন্নতি সাধন করিতেন। যতক্ষণ চন্দ্রোদয় না হয় ততক্ষণ নক্ষত্রালোকই শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। যতদিবস কৃষ্ণতত্ত্ব অপ্রকাশিত ছিল, ততদিবস মানবগণ গুণাবতার, অংশাবতার ও যুগাবতারের সাধনে কিছু কিছু উন্নতি সাধন করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব অবতার তত্ত্ব নহে। ইহাই স্বরূপ তত্ত্ব। অবতার-বীজ যে পরব্যোমস্থিত নারায়ণ তিনিও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাংশ মাত্র, অতএব দেবতারা যে কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইয়া ধন্য হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি ?

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৩৯

ন তে হভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবে। নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি॥

হে ঈশ! তুমি অসংসারী সুতরাং ক্রীড়া ব্যতীত তোমার অবস্থার কারণ আর কিছুই স্থির করিতে পারি না। অবিদ্যাকৃত জীবের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইয়া থাকে তাহা হইতে অভয় ও আশ্রয় কেবল তোমাতেই লক্ষ্য হয় যেহেতু তুমি নিত্যমুক্তস্বরূপ।

কৃষ্ণতত্ত্বকে স্বরূপসত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করত পুনরায় উহার আবির্ভাব প্রকাশ করায় উহাকে অবস্থার বশীভূত করা হয় এই তর্ক দেবতাদের মনে উদয় হইল। স্বরূপসত্যে অবস্থা থাকিতে পারে না অতএব এপ্রকার অবস্থার ঘটনায় সত্যের স্বরূপতার ব্যাঘাত হয়। ইহার দ্বারা সত্য সম্বন্ধীয় হইয়া পড়ে। ইহার তর্কের দ্বারা কোন মীমাংসা হইতে পারে না এজন্য দেবতারা স্থির করিলেন যে জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকল বিধির বিধাতা অথচ কোন বিধির বাধ্য নহেন। বিধি সকলও তাঁহারই ক্রীড়া। বিধি সকলের বাধ্য হইয়া আমাদের পক্ষে মীমাংসার যে কিছু কষ্ট বোধ হয় তাহা ঈশ্বরে সম্ভব হয় যেহেতু তিনি কোন বিধির বশীভূত নহেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিচারে যাহা অঘটনীয় বোধ হয় তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে অনায়াসেই ঘটিতে পারে। আবির্ভাব ও তিরোভাব যদিও অবস্থা বটে এবং অবস্থাহীন পদার্থে ঐ সকল সম্ভবে না তথাপি ঈশ্বরের লীলাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিতে পারে যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যদিও সকল বস্তুই অবস্থার বশীভূত হইলেই সংসারী হয় এবং বিধিবন্ধনে পতিত হয় তথাপি জগদীশ্বর ক্রীড়া বশত সকলই করিয়াও স্বীয় বিধিতে বদ্ধ হন না। স্বতন্ত্রতাই ঈশ্বরের স্বভাব। জীব মায়াকে স্বীকার করিলেই বদ্ধ হয়। বদ্ধ হইলে জন্ম মরণ রূপ বিধি বন্ধে পড়িয়া যায়। কিন্তু পুনরায় নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই জীব মুক্ত হয়। অতএব অবস্থা অবলম্বনেও ঈশ্বরের বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অনেক পণ্ডিতেরা জগদীশ্বরকে অচিন্ত্য বলিয়া ব্যাখা করিয়া আত্মপ্রত্যয় অনুভবকে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের উপলব্ধি স্বীকার করিলে জগদীশ্বর চিন্তনীয় হইয়া পড়েন এবং অবস্থার বশীভূত হন। তাঁহাদের বিচারে স্বরূপ সত্য জীব কর্ত্তৃক কখনই প্রাপ্ত হয় না। এই সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ এই সকল কুতর্কের দ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মাকে বঞ্চনা করেন। জীবের পক্ষে ঈশ্বর স্বভাবতই দুরূহ কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছা ক্রমে জীবের প্রতি আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হন। ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। পরমেশ্বর যে অচিন্তনীয় হইয়াছেন সেও তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত বিধির বিধাতাই তিনি, অতএব যে সমস্ত বিধির দ্বারা ঈশ্বরের দুরবগাহ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ঐ সমস্তবিধির ঈশ্বর ব্যতীত আর কে বিধাতা হইতে পারে। যে শক্তির পরিচালনায় পরমেশ্বর প্রাকৃত দেহ, বাক্য ও মনের অগোচর হইয়াছেন ঐ শক্তির কার্য্যক্রমে

তিনি অপ্রাকৃত আত্মার অনুভব বৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করিয়াছেন। জগদীশ্বর স্বেচ্ছাক্রমেও যদি আমাদের প্রত্যক্ষ না হইতে পারেন তবে তাঁহার ঈশিতার অভাব হয়। আত্মপ্রত্যয়কে যেসকল লোক স্বীকার করিতে না পারেন তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। অতএব আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতাকে অবস্থাদোষ কহা যাইতে পারে না। জীবের অবস্থা ভেদে পরমেশ্বরের যে ধ্যানভেদ তাহাও ঈশ্বরের লীলা মাত্র, অবস্থান্তর নহে। তবে জীবের অবস্থার সমাপ্তিতে যে স্বরূপসত্য-রূপ কৃষ্ণ তত্ত্বের প্রকাশ হয় তাহাতে কি প্রকার অবস্থা হইবার সম্ভাবনা।

স্বরূপসত্য যে কি, ইহা লইয়া পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ অনেক কুতর্ক করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ সমুদয় কুতর্কের দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বকে প্রাকৃত বলিয়া প্রকাশ করত জগতকে কলুষিত করেন। ঐ সকল কুতর্কের সমাধা করণাভিপ্রায়ে এই স্থলে স্বরূপ সত্যের লক্ষণ ও ঐ লক্ষণ সকল দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যান করা গেল। স্বরূপ সত্য নিম্নলিখিত সাতটী লক্ষণে লক্ষিত হয় যথা—

১। দেশকাল ভেদে স্বরূপসত্যের পরিবর্ত্তন হয় না।

২। সকলেই স্বরূপ সত্যের অধিকারী।

৩। স্বরূপসত্য ঐতিহাসিক বা কল্পিত নহে।

৪। স্বরূপসত্য অতুল্য, অগোপ্য, স্বতঃপ্রকাশিত ও সুলভ।

৫। স্বরূপসত্য বিচার কালে সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে।

৬। স্বরূপসত্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সর্ব্বাকর্ষক, কল্যাণপ্রদ ও স্নিগ্ধকর।

৭। স্বরূপসত্য নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা শোভিত, কোন প্রকার অলঙ্কারে উহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি দূরে থাকুক সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া যায়।

কৃষ্ণতত্ত্ব এই সমুদয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে স্বীকৃত। যে কেহ বৃহদ্ব্রহ্মকে ভাবনা করেন অথবা সর্ব্বগ পরমাত্মার চিন্তা করেন অথবা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণের স্মরণ করেন তিনিই ঐ সমুদয় মূর্ত্তিতে কেবলানুভবানন্দের প্রতিষ্ঠা করেন। কেবলানুভবানন্দে ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ত্ব অথবা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য অনুভব করা যায় না। অতএব সমুদয় ঈশ্বর চিন্তার সারভাগকে কেবলানুভবানন্দ বলি। ইহাই স্বরূপসত্য, যেহেতু ইহা খণ্ড হইতে পারে না। ভক্তি কেবলানুভবানন্দের অনুগত ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভক্তির বিষয় নহে। অতএব কৃষ্ণভক্তিই সার। পরমাত্মা বা ব্রহ্মোপাসনা অযুক্ত পরিশ্রম মাত্র।

সকলেই স্বরূপ সত্যের অধিকারী। মনুষ্য মাত্রেরই আত্মায় স্বরূপ সত্যের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই আত্ম প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ। যাঁহারা এই আত্মপ্রত্যয়কেই অস্বীকার করেন তাঁহারা বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকেও অস্বীকার করেন।

ইহা কেবল তাঁহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম বা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা সকলের দ্বারা উপলব্ধ হন না। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মকে ও যোগীরা পরমাত্মাকে বুঝিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই অনুভবানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণের অধিকারী। কৃষ্ণ ভজনে ব্রাহ্মণত্ব অথবা যোগের প্রয়োজন নাই। যাহারা অধিক পরিশ্রমের দ্বারা যোগসাধন করে তাহারাই দুরূহ পরমাত্মার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পায় কিন্তু সম্যক্ বুঝিতে পারে না। সাধারণে পরমাত্মা শব্দ শুনিবামাত্র কোন একটী জড়ীভূত পদার্থ থাকা স্বীকার করে। কিন্তু অধিক পরিশ্রম ব্যতীত ঐ পরমাত্মার উপলব্ধি প্রাপ্ত হয় না। ঐ প্রকার প্রাপ্তিরও ফল সামান্য, যেহেতু পরমাত্মা স্বরূপ নহে, অনুরূপ মাত্র। যাহারা মানস বিজ্ঞানের অধিকতর চালনা করে তাহারা বৃহদ্ব্রহ্মকে জানিতে পারে এবং ঐ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্ম হয়। ঐ ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলও সামান্য, যেহেতু তদ্দ্বারা স্বরূপপ্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল স্বরূপের যে ঐশ্বর্য্য তাহাই উপলব্ধ হয়। ব্রাহ্মণ ও যোগী হওয়া যদিও কঠিন তথাপি কৃষ্ণভক্ত অপেক্ষা ঐ ব্রাহ্মণ ও যোগী অনন্ত গুণে ন্যূন। যদি এরূপ বিতর্ক হয় যে, কেবলানুভবানন্দ কৃষ্ণ যদি সকলেরই প্রাপ্য, তবে জীবের উচচতা ও নীচতা কিজন্য হইয়াছে। সকলেই কি জন্য বৈষ্ণব না হয় তবে তাহার উত্তর এই যে কৃষ্ণ সকলেরই প্রত্যক্ষ কিন্তু কতকগুলি লোক কুতর্ক্ক সহকারে অনুভবানন অস্বীকার করত ব্রাহ্মণ অথবা যোগী হয়, কেহ কেহ মূর্খতা বশত ঈশ্বরপ্রেমে বিরত হইয়া জড়বৎ অবিদ্যার সহিত ক্রীড়া করে ও কেহ কেহ কর্ম্মান্ধপ্রায় হইয়া নাস্তিক হইয়া উঠে। সূর্য্য যদিও সকলের পক্ষে প্রত্যক্ষ, তথাপি দিনান্ধ উলুক বা পেচক এবং চক্ষুকে যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা ঐ সূর্যের প্রকাশকে জানিতে পারে না। উলুক অথবা দৃষ্টিশক্তি অবিশ্বাসকারী পুরুষের দোষে সূর্য্যের দোষ হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত যদিও বৈষ্ণবগুণে আপনাকে অতিশয় ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া থাকেন তথাপি ব্রাহ্মণ বা যোগী অপেক্ষা তিনি অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট, যেহেতু স্বরূপাধিকারী অনুরূপ অথবা বৃহদ্রূপ অধিকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্বরূপসত্য ঐতিহাসিক বা কল্পিত নহে। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সমুদয় দেশ ও কালে আবদ্ধ এবং প্রাকৃত। রাজা হরিশ্চন্দ্র সমস্ত পৃথিবী দান করিয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। হরিশ্চন্দ্র বিগত হইয়াছেন ও পূর্ব্বকল্পেও ছিলেন না অতএব হরিশ্চন্দ্রও নিত্য নহেন। হরিশ্চন্দ্রের জীবাত্মা যদিও পূর্ব্বে ছিল ও এখনও ঈশ্বর স্বেচ্ছায় অবস্থিতি করিতেছে, তথাপি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটী বিগত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ তত্ত্ব তদ্রূপ নহেন। অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত কৃষ্ণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ। জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ জীব ও কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত রাসলীলা জীবের সহিত সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব ঐতিহাসিক না হওয়ায় স্বরূপসত্য বলিতে হইবে। কল্পনা মনের কার্য্য ; অপ্রাকৃত পদার্থে মনের অধিকার নাই। অতএব কৃষ্ণতত্ত্বে সকল আত্মারই অধিকার। ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক। পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই ছিলেন,

তাঁহার কোন শক্তির তখন চালনা হয় নাই। যখন সৃষ্টি হইল, তখন বৃহদ্ব্রহ্মের প্রকাশ ও শক্তির চালনা হয়। ইহাই বেদের মধ্যে ঐতিহাসিকরূপে বর্ণিত আছে। সৃষ্টি করত পরমেশ্বর সৃষ্ট পদার্থে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মার প্রকাশ করেন। ইহাও ঐতিহাসিক, যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছা নিবৃত্তি হইলে পুনরায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অনুভবানন্দরূপ কৃষ্ণে বিলীন হয়। অনুসন্ধান, ধারণা, গ্রহণ এ সমুদয় মনের কার্য্য এবং এই সকল বৃত্তির দ্বারা যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপলব্ধি হয় তাহা কাল্পনিকের ন্যায় অনিত্য।

স্বরূপসত্য অতুল্য, অগোপ্য, স্বতঃপ্রকাশিত ও সুলভ। পূর্ব্ব বিচারেই কৃষ্ণতত্ত্ব অতুল্য প্রদর্শিত হইয়াছে যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব ইহার তুল্য হইতে পারে না। সকলেই যখন কৃষ্ণতত্ত্বে অধিকারী তখন সুতরাং ইহাকে অগোপ্য কহিতে হইবে। কৃষ্ণতত্ত্ব সমূদয় তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ হইলেও উচ্চরবে পরিকীর্ত্তিত হয়, যেহেতু অসৎ পদার্থই লোকে গোপন করিয়া থাকে। ইহাতেই বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রসকল অপেক্ষা কৃষ্ণতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। ইহা স্বতঃপ্রকাশিত, যেহেতু দেহেন্দ্রিয়গণ অথবা মন ও বাক্য, এই সকলকে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয় না। জীবাত্মা কেবল সুলভ বিশ্বাসের দ্বারাই অনায়াসে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তর্ক ও বিচার করিতে গেলে দুরূহ হইয়া উঠে। অতএব ইহা নিতান্ত সুলভ। কৃষ্ণভক্ত হইতে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্ব অধিক বিচারের দ্বারা সংগৃহীত হয় অতএব নিকৃষ্ট হইলেও সুলভ হয় না। জীবের স্বভাব যত সুলভ হয় উহার বিপরীতাচরণ তত সুলভ নহে। কৃষ্ণদাসত্ব জীবের স্বভাব এ প্রযুক্ত সুলভ।

স্বরূপসত্য বিচারকালে সর্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে। স্বরূপসত্য স্বতঃপ্রকাশিত হওয়ায় বিচারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিচার করিলেও সুন্দররূপে স্থাপিত হয়। প্রমাণ চারি প্রকার অর্থাৎ শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য, ও অনুমান। শ্রুতিসকল যদিও ব্রহ্মের গান করিয়া থাকে তথাপি তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন উপাস্য বস্তু নাই, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ করে। ব্রহ্মকে উপাদানকারণ-রূপে ব্যক্ত করিয়া ব্রহ্মাতীত কোন এক পরম পুরুষের উল্লেখ করিয়া থাকে। দশম স্কন্ধে বেদস্তুতিতে শ্রুতিসকল যে গোপীদেহ প্রাপ্তির অর্থ যে যতকাল বিচারাহঙ্কারে শ্রুতিগণ কাল যাপন করিয়াছিল ততদিবস তাহারা শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু তর্ক ও জ্ঞানকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যখন আত্মপ্রত্যয়কে স্বীকার করিল, তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের অধিকারী হইয়া কৃষ্ণসেবা করিল। অতএব নারায়ণ উপনিষৎ ও গোপাল তাপনী ও সাধারণত সমুদায় উপনিষৎই কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যখ্যা করে। প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় প্রমাণ আত্মার যে প্রত্যক্ষতা তাহাই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষতা অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু জীবের উহাই সাক্ষাদ্দর্শন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তাহাতেই প্রত্যক্ষ হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ঐতিহ্য তৃতীয় প্রমাণ। সমস্ত ইতিহাস ও মহাজন প্রসিদ্ধিকে ঐতিহ্য কহা যায়। সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে

দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনুভবানন্দ ব্যতীত মহাজনেরা আর কোন পদার্থকেই ঈশ্বরস্বরূপ বলেন নাই। অনুভবানন্দ স্বীকার করত যেসকল পুরুষেরা ভক্তিপথকে অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই দেশ বিদেশে গুরুপদাভিষিক্ত হইয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপাসনা করেন। ভাষাভেদে ও নামভেদে পদার্থভেদ হইতে পারে না। অনুমানই চতুর্থ প্রমাণ। দৃষ্ট পদার্থ হইতে গুহ্যসত্যের আবিষ্করণ শক্তিকে অনুমান কহা যায়। যুক্তিই ফলত আত্মার পক্ষে অনুমান যেহেতু আত্মার প্রত্যক্ষ যে আত্মপ্রত্যয় তাহা যুক্তির পক্ষে অবশ্যই গুহ্য। ঐ গুহ্যকে যুক্তিও বহুযত্নে স্থাপনা করিয়াছেন। যুক্তি সমস্ত পদার্থ বিচার করত তন্ন তন্ন করিয়া অবশেষে এক আনন্দকেই লক্ষ্য করেন। যদিও যুক্তি আনন্দকে বুঝিতে পারেন তথাপি উহাকে সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

স্বরূপসত্য সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাকর্ষক, কল্যাণপ্রদ ও স্নিগ্ধকর। কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যেহেতু দেশ, কাল, গুণ সমুদয় ও তটস্থ বিচারে ইহা বিকৃত নহে। কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা দূষিত নহে। সমুদয় তত্ত্ব ইহার অধীন তত্ত্ব, সিংহত্ত্বরূপে ইহাই পুরুষ। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরতার দ্বারা ইহার পুরুষত্ব প্রতিপাদন হয়। ইহাতে যত প্রকার গুণই থাকুক না কেন সমুদয় বিপরীত হইলেও অবিরোধী। ইহাতেও ইহার পুরুষত্ব প্রতিপাদন হইতেছে। সমস্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আশ্রয় কৃষ্ণ। তাহাতে ঐ সকল গুণ ও ঐশ্বর্য্য স্ত্রীত্ব ভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণকে একমাত্র পুরুষরূপে বরণ করিয়াছে। গুণ ও গুণাধার কৃষ্ণে অধীন অধীশ্বর সম্বন্ধ। অন্যত্র বিপরীত গুণের সামঞ্জস্য সম্ভবে না, কিন্তু যথার্থ পুরুষরূপ কৃষ্ণে কোন প্রকার বিরোধ উৎপত্তি করিতে বিপরীত গুণদিগের ক্ষমতা নাই, যেহেতু জড়গুণ সমুদয় সচ্চিদানন্দের অবশ্যই বশীভূত। সৌন্দর্য্যই সমস্ত গুণের চরম। সৌন্দর্য্য প্রযুক্ত কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক। ইহাই স্বরূপতত্ত্ব-রূপ কৃষ্ণের প্রধান ক্রিয়া। অতএব সেই পুরুষ যথার্থই বংশীধারী। ঐ বংশীধারী পুরুষই সংসাররূপ অকল্যাণ হইতে জীবকে উদ্ধার করায় কল্যাণপ্রদ। অতএব ঐ বংশীধারী মহাপুরুষই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হইয়া সংসারী জীবগণকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ করেন। স্নিগ্ধতাই তাঁহার পরম কল্যাণ অতএব ঐ পুরুষের উজ্জ্বল স্নিগ্ধকর শ্যাম বর্ণই প্রত্যক্ষ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা, সর্ব্বাকর্ষকতা, কল্যাণপ্রদতা ও স্নিগ্ধকরতা ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় নাই। অতএব কৃষ্ণতত্ত্বই স্বরূপ তত্ত্ব। যেহেতু এই সমুদয় লক্ষণই কেবলানুভবানন্দ ব্যতীত আর কিছুতেই নাই।

স্বরূপসত্য নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা শোভিত, কোন প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা উহার সৌন্দর্যবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া যায়। বৃহত্তত্ত্ব ও অণুত্ব এই দুইটী অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত হয়। অনুভবানন্দকে বৃহত্তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত করিলে ব্রহ্ম হয় ও অণুত্বে অলঙ্কৃত করিলে পরমাত্মা হয়। অতএব ব্রহ্মে ও পরমাত্মায় স্বরূপ সৌন্দর্য্য রহিত হইয়া অলঙ্কার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

জীব ঈশ্বরের স্বরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারী অতএব অলঙ্কার-সৌন্দর্য্যে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বরূপ স্বরূপ সৌন্দর্য্যের উপাসক হয়। ব্রহ্মোপাসকগণ বৃহত্তত্ত্বকেই স্বরূপ কহিয়া উহাতে জড়িত আনন্দাভাসকে প্রাপ্ত হন। যোগীগণ বৃহত্তত্ত্বের ক্লীবত্ত্ব জানিয়া ঈশ্বরকে অণু হইতেও অণু বিচার করিয়া হৃদয় মধ্যে সূক্ষ্ম সর্ব্বাব্যাপী ঈশ্বরের চিন্তা করেন। কিন্তু উভয়েই যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হন নাই বলিতে হইবে; যেহেতু বেদ ঈশ্বরকে অণু হইতে অণু ও মহৎ হইতে মহৎ কহিয়াছেন। অণুত্ত্ব ও মহত্ত্ব ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমাত্র ; স্বয়ং ঈশ্বর নহে। এই প্রকার ঈশ্বরের একটী একটী অলঙ্কার অবলম্বন করিয়া উপাসনা করত কেহ ব্রাহ্ম, কেহ শৈব, কেহ যোগী নাম দিয়া একটী একটি সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বরূপসত্য কেবলনুভবানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সম্প্রদায় সম্ভবে না। সাম্প্রদায়িকরা শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারাচ্ছাদিত ও গুণ-বিকৃত ভাবনিচয়ের উপাসক, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইতে পারেন না। অন্যান্য সাম্প্রদায়িকদিগের ভাব দূরে থাকুক শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণও ঈশ্বরের অখিল ঐশ্বর্য্য ও গুণ সকল দ্বারা অলঙ্কৃত অর্থাৎ স্বরূপাচ্ছাদিত মহারাজ রাজেশ্বর ভাব গ্রহণ করিয়াও সাক্ষাৎ কেবল অনুভবানন্দ রূপ শ্রীকৃষ্ণোপাসনায় বিলম্ব প্রাপ্ত হন।

অতএব দেবগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি স্বরূপ সত্য। যেহেতু কৃষ্ণতত্ত্ব তোমার ক্রীড়াবশত সাক্ষাৎ অনুভূত হয়, অন্যান্য তত্ত্বের ন্যায় বদ্ধ ভাব-মলযুক্ত নহে। এই কৃষ্ণতত্ত্বই জীবের বৈভবস্বরূপ কোন সম্প্রদায় নির্ণীত গোপ্য বিষয় নহে। ইহাতেই জীবের চূড়ান্ত ভব নিরোধ সম্ভবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০.২.৪০

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসঃ

রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।

ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ

ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥

হে ঈশ! তুমি পূর্ব্বে, মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র এবং দেব এই সকলে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে যদ্রূপ পালন করিয়াছ এক্ষণেও তদ্রূপ পালন কর অধিকন্তু এই ভূমি ভার হরণ কর। হে যদুত্তম! তোমাকে বন্দনা করি।

আত্মারাম অবতারের ব্যাখ্যায় ভগবানের অসংখ্য অবতারের বর্ণনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমুদয় অবতার তিন ভাগে বিভক্ত হয়। রাজসিক ও তামসিক অবতারের বিষয় এস্থলে বক্তব্য নহে, যেহেতু ঐ সকল অবতারের কোনপ্রকার উপাসনা কর্ত্তব্য নহে। সত্ত্বগুণের যে অবতার তাহাই সাধুগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বকালে বিচার্য্য। এজন্য মৎস্য প্রভৃতি অবতারের উল্লেখ এস্থলে করিয়াছেন। সত্ত্বনিধি বিষ্ণুও সর্ব্বকালে এবং সর্ব্ব অবস্থায় জীবের নিকট অবতাররূপে প্রত্যক্ষ হন।

চৈতন্যবিশিষ্ট জীবের কীট হইতে সাধু মানবদেহ পর্য্যন্ত বহুবিধ অবস্থা। এই অবস্থা নানাবিধ হইলেও বিজ্ঞানশাস্ত্রের দ্বারা কতকগুলি লক্ষণানুসারে পণ্ডিতেরা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জলকীটের মধ্যে অনেকগুলি নির্দ্দণ্ডী ও কতকগুলি বজ্রদণ্ডী। বিমানচারী ও ভূচর জীবের মধ্যে অনেকগুলি মেরুদণ্ডী, এই প্রকার বহুবিধ লক্ষণের দ্বারা মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ প্রভৃতি জীবের অবস্থায় শ্রেণী প্রকাশক হয়। পুনরায় ক্ষুদ্রাকার হইতে বৃহদাকার মানব ও অসভ্য মানব হইতে সুসভ্য মানব এই প্রকারে অনেক প্রকার শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে জীবের সমস্ত অবস্থাতেই মঙ্গলস্বরূপ সত্ত্বনিধি বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু জীবের সহচর। অতএব জীবের যতপ্রকার শ্রেণী বিভক্ত অবস্থা, বিষ্ণুর ততপ্রকার আবির্ভাব অবতার স্বীকার করা যায়। শ্রেণীবিভাগের প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। কেহ বা জীবের নির্দ্দণ্ডী অবস্থা হইতে শ্রেণীবিভাগ করিতে করিতে মৎস্য অবতার হইতে অবতারের ব্যাখ্যা করেন, কেহ বা মানবের আদিম অবস্থা হইতে বিচার করিয়া ঋষভ দেব হইতে অবতারের আরম্ভ দৃষ্টি করেন। বিষ্ণু সর্বকালেই পালনকর্ত্তা। জীবের যে অবস্থায়ই স্থিতি হয় ঐ অবস্থার ভাবানুযায়ী ঈশ্বরভাব উদয় হইয়া পালন করে। অবস্থা বিচারই এই সকল তটস্থ অবতারের একমাত্র কারণ। মৎস্য অবতার হইতে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব পর্য্যন্ত তটস্থাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায়। শ্রীকৃষ্ণাবতার তটস্থ নহেন স্বরূপ তত্ত্ব। মানবের সমুদয় বিচার সিদ্ধান্ত হইলে আত্মপ্রত্যয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ পায়। কৃষ্ণতত্ত্ব বিচারের দ্বারাও বহুদর্শিতার দ্বারা উদ্ভাবিত হয় এমত নহে। এই তত্ত্ব জীবের চিরসঙ্গী কিন্তু জীব যতদিবস মূর্খতাবশত আত্মপ্রত্যয় বৃত্তি

স্বীকার করে নাই ততদিবস কৃষ্ণতত্ত্ব অপ্রকাশিত থাকে। সাত্বত বংশেই এই পরমতত্ত্বের আবির্ভাব হয় এজন্য দেবগণ যদূত্তম বলিয়া ভগবানকে সম্বোধন করিলেন। সাত্বতগণই সাধু, যেহেতু তাহারা কুতর্কের দ্বারা আত্মপ্রত্যয়কে অস্বীকার করে না। জীবের নির্দ্দণ্ডী অবস্থায় মৎস্যবতার, বজ্রদণ্ডী অবস্থায় কচ্ছপাবতার ও মেরুদণ্ডী অবস্থায় বরাহ অবতার বলা যায়। ঐ মেরুদণ্ডের দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রথমে নৃসিংহ, পরে বামন, পরে পরশুরাম, পরে রামচন্দ্র ও অবশেষে জ্ঞানের পূর্ণাবস্থায় পরব্যোমস্থিত দেব দেব নারায়ণ এ সমুদয় অবতার দৃষ্ট হয়। ইহাতে জীবের ক্রমশোন্নতিই বিচারিত হইতে পারে। কিন্তু সাত্বতকুল যখন যুক্তির হস্ত হইতে বিচারকে উদ্ধার করতঃ কেবলানুভবানন্দে নিযুক্ত করেন তখন স্বরূপতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমুদয় অবতার স্বীকার করত ভগবান জীবকে উন্নতি ও পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সমস্ত অবতারের গৌণ কার্য্যে যদিও ভার হরণ দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি মায়াগুণ গ্রহণে জীবের গলগ্রহরূপ ভার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন অবতারেই সাক্ষাৎ উপনীত হয় না। ইহাই কৃষ্ণের বিশেষ মাহাত্ম্য।

মানবের আদিম অবস্থানুসারে যাঁহারা অবতার প্রণালী বিচার করিয়াছেন তাঁহারা ঋষভদেব হইতে আরম্ভ করেন। পৃথু অবতারে মানবেরা কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল এই প্রকার চব্বিশ অবস্থায় চব্বিশটী অবতারও দৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে অবতারদিগের দ্বারা জীবের উৎকর্ষতাই দৃষ্ট হয়। নারদাবতারে ভক্তিমার্গ সংস্থাপন ও ব্যাসাবতারে সমস্ত জ্ঞানের পরম আধার যে শ্রীমদ্ভাগবত তাহা প্রকাশিত হয়। এ প্রণালীক্রমেও কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ফলত সমস্ত উন্নতি ও জ্ঞানের ফলই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। ইহাই জীবের শেষ প্রাপ্য। শ্রবণই জ্ঞানের সংগ্রহ, কীর্ত্তন জ্ঞানের ব্যাখ্যা, বিষ্ণুস্মরনই ধারণা, অর্চ্চনই পূজা ও প্রতিষ্ঠা এবং বন্দনই জ্ঞানের চরমকারন। বন্দনার সহিত জ্ঞানের সমাপ্তি হয়। বন্দনার পর দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ও মধুর রূপ দ্বিবিধ আত্ম নিবেদন। অতএব দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনই জ্ঞানশূন্য ভক্তিবাচ্য। দেবতারা এই জ্ঞানগর্ভ স্তবে কেবল বন্দনা পর্য্যন্ত অধিকার দৃষ্টি করিলেন। জ্ঞানহীন যে ভক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিবার যোগ্যস্থল বোধ করিলেন অতএব দেবগণ কহিলেন, হে যদূত্তম! আমরা তোমাকে বন্দনা করি। প্রথম শ্লোকে প্রপত্তি স্বীকার করায় যে দাস্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সে উপাসনারূপ দাস্য নহে। কেবলানুভবানন্দ রূপ স্বরূপতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও সংস্থাপনরূপ যে কৃষ্ণদাস্য তাহাই প্রথম শ্লোকের প্রপত্তির অর্থ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী রস ব্রজলীলাতে পূর্ণরূপে অবস্থান করে। এই অল্পবুদ্ধি লেখকের যদি সাবকাশ হয় এবং তদীয় প্রভু চৈতন্যদেব যদি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে কোন সময়ে চরম ফল স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত চারিটী রসপূর্ণ ভাগবতের ব্রজলীলা লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

এই টীকা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম যে ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন তাঁহার সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং মায়াভাব উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবেশিকা-স্বরূপ এই টীকা সকল লোক পাঠ করিয়া অমৃত হউন। শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রের পদযুগে প্রণাম করত সমস্ত বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম আমার মস্তকে ধারণ করিলাম।

সম্বন্ধ তত্ত্ব চন্দ্রিকা সমাপ্ত।